জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৩

নাগরিক উদ্যোগ

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

রাজনৈতিক সহিংসতায় বিপন্ন মানবাধিকার

◎ ২০১৩ সালে প্রণীত ও সংশোধিত আইনের প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা

সাক্ষাৎকার

আন্তর্জাতিক নদীর পানিতে অধিকার অববাহিকার সমগ্র মানুষের- অধ্যাপক ড. খালেকুজ্জামান

◎ নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতন

joyeeta জয়িতা বাংলার নারী

স্টল নং A/25

জয়িতায় দলিত নারীদের নিজস্ব পণ্যের সমাহার

এখানে সুলভ মূল্যে পর্দা, বেড সিট, কুশন কভার, থ্রি-পিছ, বিভিন্ন ডিজাইনের লেইস, গজ কাপড়, হাতের কাজের শাড়ি পাওয়া যায়।

স্টল নং A/25, রাপা প্লাজা, তৃতীয় তলা, জয়িতা, ধানমন্ডি ২৭ (পুরাতন)।

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

নাগরিক উদ্যোগ
সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

অবস্থান	আকার	রঙিন/সাদা-কালো	মূল্য
ব্যাক পেজ	পূর্ণ পৃষ্ঠা	রঙিন	২৫,০০০/-
ব্যাক পেজ	অর্ধ-পৃষ্ঠা	রঙিন	১৩,০০০/-
কাভার পেজ ইনার	পূর্ণ পৃষ্ঠা	রঙিন	২০,০০০/-
কাভার পেজ ইনার	অর্ধ-পৃষ্ঠা	রঙিন	১০,০০০/-
ব্যাক পেজ ইনার	পূর্ণ পৃষ্ঠা	রঙিন	১৫,০০০/-
ব্যাক পেজ ইনার	অর্ধ-পৃষ্ঠা	রঙিন	৮,০০০/-
ভেতরের পৃষ্ঠা	পূর্ণ পৃষ্ঠা	সাদা-কালো	১০,০০০/-
ভেতরের পৃষ্ঠা	অর্ধ-পৃষ্ঠা	সাদা-কালো	৬,০০০/-

নাগরিক উদ্যোগ

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৩
বর্ষ: ০২ সংখ্যা: ৩য় ও ৪র্থ

সম্পাদক
জাকির হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
হোজ্জাতুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
আলতাফ পারভেজ
মাজহারুল ইসলাম
মাহাবুবা সুলতানা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
বারেক হোসেন (মিঠু)

প্রচ্ছদের ছবি
সুবির দেওয়ান, নাগরিক উদ্যোগ ও ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

আলোকচিত্র
নাগরিক উদ্যোগ ও ইন্টারনেট

প্রকাশক
সম্পাদক কর্তৃক ৮/১৪, ব্লক-বি লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৮৬৮
ফ্যাক্স : ৯১৪১৫১১
ই-মেইল : nuddyog@gmail.com

মুদ্রণ
প্রকাশক কর্তৃক নূর কার্ড বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী, ১৯/১, নীলক্ষেত বাবুপুরা ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

দাম : ২০ টাকা।

রাজনৈতিক সহিংসতায় বিপন্ন মানবাধিকার ৩

২০১৩ সালে দেশব্যাপী সংঘটিত রাজনৈতিক সহিংসতায় ভূলুণ্ঠিত হয় সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি। রুদ্ধ হয়ে পড়ে আতঙ্কগ্রস্থ মানুষ, বিপর্যস্ত হয় অর্থনীতি। সংকটকালীন এই সময়ের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন মাজহারুল ইসলাম ও ড. মিজানুর রহমান নাসিম।

২০১৩ সালে প্রণীত ও সংশোধিত আইনের প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা ১১

রাজনৈতিক অস্থিরতা-সংঘর্ষ এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতির ডামাডোলেও ২০১৩ সালে দেশে বেশ কয়েকটি আইন প্রণীত হয়েছে। এগুলোর কোনো কোনোটি জনহিতকর, আবার কোনোটি জনস্বার্থবিরোধী। ২০১৩ সালে প্রণীত এ সকল আইনের পর্যালোচনা করেছেন এ্যাডভোকেট শামিম আল মামুন।

‘আন্তর্জাতিক নদীর পানিতে অধিকার অববাহিকার সমগ্র মানুষের’ ২৪

দক্ষিণ এশিয়ার আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানির বণ্টন ব্যবস্থা ও এর প্রভাব নিয়ে নাগরিক উদ্যোগ ত্রৈমাসিক-এর সাথে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের লক হ্যাভেন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক খালেকুজ্জামান।

- নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতন ১৭
  নূর-এ-জান্নাতুল ফেরদৌস রুহী
- শিশুশ্রম কি কখনো বন্ধ হবে না? ১৯
  ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু
- দলিত জনগোষ্ঠী : আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ ২০
  সভায় উপস্থাপিত নিবন্ধ
- কেন ও বেতোয়া নদীর মাঝে কৃত্রিম খাল তৈরি শুরু ২৮
  আলতাফ পারভেজ
- পদবি প্রথা বিলুপ্তিকরণ প্রসঙ্গে ৩১
  এ্যাডভোকেট বাবুল (রবিদাস)

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক সহিংসতার অবসান জরুরি

রাজনৈতিক দলগুলোর মতবিরোধের জের ধরে গাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও বোমা বিস্ফোরণে সাধারণ মানুষের হতাহতের ঘটনা বাংলাদেশে যেন এক অনিবার্য বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিচারপতির বাসভবন, মিডিয়া হাউস ও সংবাদকর্মীরাও এই রাজনৈতিক ক্রোধ বা সহিংসতার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। শুধু ২০১৩ সালেই রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত হয়েছে ৫৭৩ জন মানুষ এবং আহত মানুষের সংখ্যা ১০ হাজারেরও অধিক। বছরের পর বছর ধরে এ ধরনের ঘটনায় প্রাণহানির সংখ্যা কেবল বাড়ছেই। কিন্তু ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের বোধোদয়ই ঘটছে না। তবে কি এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর মিছিল চলতেই থাকবে?

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিরোধী দল অবশ্যই তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে মিছিল, বিক্ষোভ, সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। তবে তা হতে হবে শান্তিপূর্ণ এবং নাগরিকের জানমালের জন্য কোনোভাবেই ক্ষতিকারক নয়। আবার সরকারি দলকেও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে জাতি এমনটাই প্রত্যাশা করে এবং রাজনৈতিক দলগুলোও প্রকাশ্যে সে ধরনের প্রতিশ্রুতিই ব্যক্ত করে থাকে। কিন্তু এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হওয়ার কারণে সহিংস কর্মকাণ্ড এখন আন্দোলনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাড়িতে আগুন দিয়ে ড্রাইভার, হেলপার ও যাত্রীদের অগ্নিদগ্ধ করে কোনো শুভ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব নয়- রাজনৈতিক দলগুলোর এ ধরনের কোনো উপলব্ধি নেই।

সহিংসতা সব সময়ই প্রতিহিংসাকে আহ্বান করে। এটা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর চরম প্রতিশোধের মনোবৃত্তিকে উস্কে দেয়। পথে-ঘাটে হরহামেশায় সহিংসতা অব্যাহত থাকলে সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়। আর তারই আশ্রয়ে সমাজে দেখা দেয় নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা। তাই এ ধরনের সহিংসতাকে রাজনৈতিক কর্মসূচি বা আন্দোলনের অংশে পরিণত করা দেশের জন্য তো নয়ই, রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যও শুভ নয়। এক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলোর যেমন সংযত হওয়া উচিত, তেমনি সরকারের কাছে কোনো ধরনের জোর-জবরদস্তিও কাম্য নয়। রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণহানির ঘটনাকে অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ নেই। এই অশুভ রাজনৈতিক সংস্কৃতি উন্নয়ন ও জনজীবনে কোনো ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আমাদের আহ্বান, সহিংসতা বন্ধে উদ্যোগ নিন এবং জনজীবনে শান্তি ও স্বস্তি নিশ্চিত করুন।

রাজনৈতিক সহিংসতায় বিপন্ন মানবাধিকার

মাজহারুল ইসলাম ও ড. মিজানুর রহমান নাসিম

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের এক ঘটনাবহুল বছর ২০১৩ সাল। এই সময়কে উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের ইতিহাসে এক ভয়াবহ রাজনৈতিক অস্থিরতা-সহিংসতার বছর হিসেবে। পুরো বছরটি ছিল সংঘাত আর সংঘর্ষে ভরা, প্রতিটি ক্ষেত্রে যার নির্মম শিকার হয়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ। বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে শেষ অবধি রাজনৈতিক সহিংসতা এমনই প্রকট ছিল যে, স্বাধীনতার পর বিগত ৪৩ বছরে এমন সহিংসতা আর দেখা যায় নি। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়ার অপরিণামদর্শী অভিপ্রায়ের চড়া মাশুল দিতে হয় দেশের সাধারণ জনগণকে। রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘোষণা ও আন্দোলন সৃষ্ট সংঘাতে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করা হয়। জনমনে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মৌলিক অধিকারসমূহ ব্যাপকভাবে হরণ করা হয়। উপর্যুপরি হরতাল-অবরোধে অবরুদ্ধ হয় জনপদ, দেশের অর্থনৈতিক খাতগুলো বিপর্যস্থ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে অবরুদ্ধ হয় নিম্ন আয়ের মানুষের রুটি-রুজির পথ। জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা এমন প্রকট আকার ধারণ করে যা থেকে মুমূর্ষু রোগী পর্যন্ত রেহাই পায় নি।

২০১৩ সালে রাজনীতির মূল উপাদান হিসেবে দেখা যায় হত্যাকাণ্ড, জ্বালাও-পোড়াও, ভাংচুর আর রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্টের এক মহাযজ্ঞ। মূলত নির্দলীয় সরকারের দাবিতে দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নেতৃত্বে ১৮ দলীয় জোটের আন্দোলন কর্মসূচি চলতে থাকে। পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হতে থাকলে এর বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকে সহিংসতার মাধ্যমে। এক পর্যায়ে তা প্রকট জঙ্গিরূপ ধারণ করে সারা দেশে একের পর এক নাশকতা চালায়। এতে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি চরম হুমকির সম্মুখীন হয়। এর সাথে যুক্ত হয় হেফাজতে ইসলামের সহিংস আন্দোলন। বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংঘাত বিশ্বব্যাপী আলোচনার অন্যতম ইস্যুতে পরিণত হয়।

এতকিছুর পরও নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে সরকার অনেকগুলো ইতিবাচক পদক্ষেপ ও আইন প্রণয়ন করেছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি, শিশু আইন, ২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন এবং জাতীয় নদী রক্ষা আইন।

রাজনৈতিক সহিংসতা

গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে চলমান রাজনৈতিক সংকট-অস্থিরতা ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের চোরাবালির ফাঁদে ঘোরপাঁক খাচ্ছে বাংলাদেশ। গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার পথে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নয়; ক্ষমতার মসনদের নিয়ন্ত্রণই এখানকার রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই চিন্তা বর্তমানে এমন বিপজ্জনক মাত্রায় উপস্থিত যে, জনগণের ন্যায্য অধিকারের বাস্তবায়ন তো দূরের কথা; নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের কৌশলী কর্মকাণ্ডে জনগণকে ব্যবহার করা হচ্ছে ঢাল হিসেবে।

গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা সরকারি দলের এ চর্চা থেকে বহুদূরে অবস্থান। সারা বছর রাজনৈতিক দ্বিমত পোষণকারীদের নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে বহু কায়দায় ও বহুমাত্রিকতায়। এ থেকে রেহাই পাননি প্রফেসর ইউনূসও। সারা বছর সরকার তাঁর বিরুদ্ধে নানামাত্রিক বিরোধে জড়িয়ে ছিল।

রাষ্ট্র জনগণের নিরাপত্তা প্রদানে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় গত ২২ বছরে প্রাণ হারিয়েছে ২ হাজার ৫১৯ জন। আর একই সময়ে কম-বেশি আহত হয়েছেন দেড় লাখ মানুষ। রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলন, হরতাল, অবরোধ, নির্বাচনী সহিংসতা ও দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে এসব হতাহতের ঘটনা বেশি ঘটেছে।[১]

২০১৩ সালে বছরব্যাপী চলতে থাকা রাজনৈতিক সহিংসতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে বছরের শেষদিকের সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বা হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয় যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। সৃষ্ট সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষকে অকাতরে প্রাণ দিতে হয়। অন্যদিকে বিরোধী দলের কর্মসূচি ঠেকাতে পুলিশি দমন, নির্বিচারে গণ-গ্রেফতার, পুলিশি প্রহরায় সরকার দলীয় নেতাকর্মী কর্তৃক বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করা হয়।

শুধুমাত্র নভেম্বর মাসেই ৫২ জনের মৃত্যু ঘটে, জখম হয় ২১,৫৭৪ জন[২] (২০১৩ এর নভেম্বর পর্যন্ত)। ২০১৩ সালে সর্বমোট নিহত হন ৫০৭ জন যা ২০১২ সালে ছিল ১১৭ জন। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ২২ হাজার ৪০৭ জন যা ২০১২ সালে ছিল ৮ হাজার ২৪ জন। বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার এক বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়: হরতাল, অবরোধ, চোরাগোপ্তা বোমা হামলা, অগ্নিসংযোগ, হেফাজতে ইসলামের উত্থান, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর হামলা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্বিচারে গুলিবর্ষণের মতো নৃশংস মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে।

২০১৩ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় নতুন মাত্রা ছিল– নির্বিচারে ও যত্রতত্র পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, খুন-জখম, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-বাড়িঘর-উপসনালয়ে ব্যাপকভাবে ভাংচুর-লুটপাট-অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, জোর করে ফসল কেটে নেওয়া, রেললাইনের স্লিপার খুলে ফেলা, গণপরিবহণে অগ্নিসংযোগ, পুলিশকে টার্গেট করা, রাস্তার পাশে নির্বিচারে গাছ কাটা ইত্যাদি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড।

রাজনীতিতে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ

সরকার ও বিরোধীদল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুতে সমঝোতায় আসতে না পারায় আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারত রাজনীতির মূল কুশীলব হয়ে ওঠে। তারা রাজনৈতিক শিষ্টাচার বর্জিত অনেক বক্তব্য প্রদান করে ও সরাসরি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মতামত প্রদান করতে থাকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে দেশের নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য সরকার ও বিরোধী দল পুরোপুরি তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যদিও কোনো অবস্থাতেই তারা তাদের অবস্থানের কোনো হেরফের করেনি। এক পর্যায়ে দূতালির জন্য আসেন জাতিসংঘের দূত তারানকো ফার্নান্ডেজ। তিনিও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান।

অসুস্থ রাজনীতির কবলে অর্থনীতি ও অর্থখাতে দুর্নীতি

গত বছরজুড়ে দেশের অর্থনীতি ছিল ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে, সাধারণ মানুষের জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এর জেরে গত দুই দশকের অর্থনীতির অর্জনগুলো ভেস্তে যেতে বসেছে। দেশে পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কমে যায় উৎপাদন। বিশেষ করে দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ পরিণত হয় উদ্যোক্তার গলার ফাঁসে। বিনিয়োগহীন অর্থের পাহাড় জমে ব্যাংকে। প্রবাসী আয় কমেছে, বেড়েছে খেলাপি ঋণ। বড় ধরনের সংকটে পড়েছে পর্যটনশিল্পও। দিনমজুররা কাজের অভাবে পড়েন বিপাকে। তারপরও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন কাজে নামার চেষ্টা করেছে নিম্ন আয়ের মানুষ। নিম্নগামী হয়েছে মাথাপিছু আয় ও মানব সূচকের উন্নয়নরেখা।

পুঁজিবাজারে ২ হাজার ১২৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকার শেয়ার সরবরাহ কমেছে। আর বাজারে লেনদেন কমেছে ৫ হাজার কোটি টাকা। সারা বছরে সূচক বেড়েছে মাত্র ৪০ পয়েন্ট। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা লাভের মুখ দেখতে পারেনি।

> বছরের শেষদিকের সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বা হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয় যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এবং পোশাকমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র হিসেবে ২০১৩ সালে হরতালে প্রতিদিনের ক্ষতির পরিমাণ দেড় হাজার কোটি টাকা। নভেম্বর ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেড় মাস সময়ে ২৩ দিনই ছিল অবরোধ ও হরতাল। শুধু নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেই পোশাক খাতে ক্ষতির পরিমাণ সাত হাজার কোটি টাকা। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দৈনিক ক্ষতি ৭৫০ কোটি টাকা। সড়ক পরিবহনে দৈনিক ক্ষতি ২৫০ কোটি টাকা, দেড় মাসে ৩০ শতাংশ পোলট্রি ফার্ম ও অধিকাংশ চালের মিল বন্ধ।[৩]

দেশের প্রায় ৯৫ শতাংশ এমপি-মন্ত্রী দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পাঁচ বছরে তাঁদের সম্পদ বেড়েছে কয়েকশ গুণ যা টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। সাবেক পূর্ত প্রতিমন্ত্রী মান্নান খানের ২০০৮ সম্পদ ছিল ২০ লাখ টাকা যা এখন হয়েছে ১১ কোটি টাকা। একইভাবে মির্জা আযমের ১ কোটি ৯১ লাখ টাকা থেকে ১৫ কোটি ৭০ লাখ টাকার সম্পদ হয়েছে। পদ্মাসেতু নির্মাণে তৎকালীন মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনসহ

সরকার দলীয় নেতা ও আমলারা জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্বব্যাংক তাদের প্রতিশ্রুত ঋণ বরাদ্দ বাতিল করে যা রাজনীতির মাঠে বছরব্যাপি আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। আবার নিয়োগ বাণিজ্যে ফেসে যায় তৎকালীন রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। এ ছাড়া হলমার্ক, সোনালী ব্যাংক, ডেসটিনি কেলেঙ্কারি আলোচনায় আসে।

বৈদেশিক সম্পর্কে স্থবিরতা

২০১৩ সালের বছরজুড়ে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে বছরের তিন মাস বৈদেশিক সম্পর্ক পুরোপুরি স্থবির ছিল। ঋণ ও উন্নয়নমূলক সহায়তা, শিল্প, বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন দেশ ও প্রতিনিধিদের বাংলাদেশ সফর স্থগিত ছিল। বাংলাদেশের প্রধান উন্নয়ন সহযোগী জাপান, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের দেশগুলোর উন্নয়ন বিষয়ক দ্বি-পাক্ষিক আলাপ-আলোচনা ও কর্মকাণ্ড পুরোপুরি বন্ধ ছিল। শুধু যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন ও ভারতের প্রতিনিধিরা সফরে এসেছেন কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন বিষয়ক নয়; বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ক।[৪] ঢাকার দূতাবাসগুলোর কর্মকর্তারাও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে গুরুত্বপূর্ণ রুটিন কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারেন নি। তাই ঢাকার দূতাবাসগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের বড় একটি অংশ ছুটি নিয়ে ঢাকা ত্যাগ করে। এ ছাড়া কয়েকটি দেশের পক্ষ থেকে এ ধরনের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার কারণে ঢাকায় না থাকারও পরামর্শ দেওয়া হয়।

নারী নির্যাতন

২০১৩ সালে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের চিত্র ছিল ভয়াবহ। সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে নারীর অগ্রগতি বড় ভূমিকা রাখলেও ঘরের মধ্যে নারীর অবস্থা তেমন বদলায় নি। নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলোর পরিসংখ্যানের হিসেবে সময়ে সময়ে খানিকটা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে মাত্র, নারী

নির্যাতন বিলোপ হয় না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশে প্রথমবারের মতো নারী নির্যাতন নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি জরিপ চালিয়েছে। 'ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন (ভিএডব্লিউ) সার্ভে ২০১১' (২০১৩ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত) নামের এ জরিপে নারী নির্যাতনের এ ধরনের চিত্রই উঠে এসেছে। সরকারের এ জরিপ বলেছে, দেশে বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনের হার বেড়েছে। আর শারীরিক নির্যাতনের শিকার নারীদের মাত্র অর্ধেক চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ পান। এক তৃতীয়াংশ নারীই স্বামীর ভয়ে বা স্বামী সম্মতি না দেওয়ায় চিকিৎসকের কাছ পর্যন্ত যেতেই পারেন নি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা ও এনজিওর তথ্য অনুযায়ী, দেশে নারী নির্যাতন ১২-১৫ শতাংশ হারে বেড়ে চলছে। নারীর সম-অধিকার নিশ্চিতকরণে ও সহিংসতা প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ১৬টি বিশেষ আইন ও নীতি থাকা সত্ত্বেও নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা হ্রাসে এসব আইন তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।[৫]

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ সালে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন চার হাজার ৭৭৭ জন নারী ও শিশু। বছরটিতে ৮২৯ জন নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। ২৩৯ জনকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। ৩৮৬ জন নারী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। ১২৭ জন নারী ও শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৩৭ জন। উত্যক্তের শিকার হয়েছেন ৪৯৪ জন এবং এ কারণে আত্মহত্যা করেছেন ২৪ জন। ৯৭৫ জন নারী বর্বর নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছেন যার মধ্যে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১৮৫ জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৯৪ জনকে। ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে আত্মহত্যা করেছেন ১৪ জন। ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে ১৫৩ জনকে। এ ছাড়া শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন ১৫৪ জন। যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৪৩৯ জন নারী এবং এঁদের মধ্যে হত্যা করা হয়েছে ২৪৫ জনকে। ফতোয়ার শিকার হয়েছেন ২৪ জন। নির্যাতনের শিকার ৮৯ জন গৃহপরিচারিকার মধ্যে ২৮ জনকে হত্যা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে আত্মহত্যা করেছে ২৫ জন। বছরটিতে এসিডদগ্ধের শিকার হন ৫০ জন। এসিডদগ্ধের কারণে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। বছরটিতে অপহরণের শিকার হয়েছে মোট ১৩১জন। মোট ২৭ জন নারী ও শিশুকে পাচার করা হয়েছে যার মধ্যে ১০ জনকে যৌনপল্লীতে বিক্রি করা হয়েছে। এসব ঘটনার বেশিরভাগই ঘটে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অবস্থানে থাকা নির্যাতিত নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে। নারী ধর্ষিত হলে টু-ফিঙ্গার টেস্ট নিষিদ্ধের দাবিতে সোচ্চার হতে দেখা গেছে মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীদের।

গুম-গুপ্তহত্যা

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আরেক অনুসঙ্গ হয়ে ওঠেছে গুম বা গুপ্তহত্যা। বেশ কিছুদিন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নানা গুম বা গুপ্ত হত্যাকাণ্ড চললেও ২০১৩ সালে তা প্রকট আকার ধারণ করে। অপহরণ, নিখোঁজ গুম বা গুপ্তহত্যার প্রায় সব ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে সাদা পোশাকের লোকজন জোরপূর্বক কাউকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন ধরে অপহৃত ব্যক্তি নিখোঁজ থাকেন এবং এরপর একদিন হঠাৎ করে তার গলাপঁচা লাশ উদ্ধার হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে কোনো খোঁজই মেলে না।

অধিকাংশ ঘটনায় ভিকটিমের পরিবারের সদস্যরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশেষ করে র‍্যাব, পুলিশ ও ডিবির বিরুদ্ধে এসব ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুললেও সাধারণত সরকারের তরফ থেকে কোনো প্রেসনোট প্রদান বা কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব স্বীকারসহ এ সব ঘটনার সুষ্ঠু আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। ২০১০ সালের ২৫ জুন ঢাকার শেরে বাংলা নগর থেকে বিএনপি নেতা চৌধুরী আলম, প্রায় দু বছর ইলিয়াস আলী ও কয়েক মাস আগে নিখোঁজ কুমিল্লার বিএনপি নেতা সাইফুল ইসলামের আজও খোঁজ পাওয়া যায় নি।

২০১৩ সালে এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়েছেন ৫৩ জন। এর মধ্যে ৫ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, ৩ জনকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে, মাত্র ২ জন মুক্তি পেয়েছেন এবং বাকিদের খোঁজ এখনও মেলে নি[৬]। ১৯৮০ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন 'ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইন ভলান্টারি ডিজঅ্যাপেয়ারেন্স' বা গুম বিষয়ক কর্মপরিষদ গঠন করে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যক্রমের ঐ বিশেষজ্ঞ দলের বাংলাদেশ সফরের অনুরোধ এখনো সরকারের সম্মতির অপেক্ষায় কেন পড়ে আছে তা বোধগম্য নয়।

> শেষ বছরে এসেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ, এনকাউন্টার ইত্যাদির নামে রাষ্ট্রীয় মোড়কে হত্যাকাণ্ড ও থানা-পুলিশসহ বিভিন্ন হেফাজতে নির্যাতন বা মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত ছিল।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হলেও বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। শেষ বছরে এসেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ, এনকাউন্টার ইত্যাদির নামে রাষ্ট্রীয় মোড়কে হত্যাকাণ্ড ও থানা-পুলিশসহ বিভিন্ন হেফাজতে নির্যাতন বা মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত ছিল। ২০১৩ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ৭১ জন। তার মধ্যে র‍্যাবের ক্রসফায়ারে ২৪ জন, পুলিশের ক্রসফায়ারে ১৭ জন, বিজিবির ক্রসফায়ারে ১ জন এবং পুলিশ হেফাজতে শারীরিক নির্যাতনে ২৬ জন, র‍্যাব ও পুলিশের শারীরিক নির্যাতনে ১ জনের মৃত্যু হয়। অধিকার'র রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১৩ সালে র‍্যাব, পুলিশ ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার হাতে বিচারবহির্ভূতভাবে ৩২৯ জন মারা গেছেন। বহুল আলোচিত বিশ্বজিৎ দাস হত্যা মামলায় ৮ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয় যাদের সকলেই সরকারি দলের সমর্থক। এছাড়া কিশোর লিমনের ওপর সরকারের দুইটি মামলা তুলে নেয়া হয়।

পুলিশি রিমান্ড

গত বছর বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তদের পুলিশি রিমান্ডে নিয়ে অভিযোগের দায় স্বীকারোক্তিতে নিপীড়নের অসংখ্য ঘটনা সংঘঠিত হয়। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের পর যেনতেনভাবে পুলিশি রিমান্ডে স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে এসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক মামলার ক্ষেত্রে পুলিশের দুটি কর্মকাণ্ড লক্ষ্যণীয়– ওপরের হুকুমে মামলা দায়ের এবং জামিনের বিরোধিতাপূর্বক রিমান্ডের আবেদন।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো স্বীকারুক্তি আদায় করা যাবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে তা গ্রাহ্য করা হয় না। ফলে সরকার থেকে রিমান্ডের আবেদন করে এবং নিম্ন আদালত থেকে তা মঞ্জুর করার মধ্য দিয়ে সংবিধানের ওই চেতনার হরহামেশা ব্যতয় ঘটে চলছে।

বাংলাদেশে রিমান্ড মানেই বিভীষিকা যা প্রায়শ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করতে ব্যবহার করা হয়। ২০০৩ সালে বিচারপতি মো: হামিদুল হক ও বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ ৫৪ ধারায় পাইকারিভাবে পুলিশের গ্রেফতার এবং তাদের আবেদনক্রমে আদালতের রিমান্ড মঞ্জুরের বিরুদ্ধে একটি বিস্তারিত নির্দেশনা জারি করেন। বাংলাদেশের সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্টের রায় নিম্ন আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় হলেও নিম্ন আদালত থেকে অনুমতি নিয়ে পুলিশি রিমান্ড কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অপরাধ যত গুরুতরই হোক না কেন প্রচলিত আইনের আওতায় তার বিচারিক কার্যক্রম চালানো রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কর্তব্য। আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড দ্বারা অপরাধীকে নির্যাতন ন্যায়বিচারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার

১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম নিয়ে সারা বছর উৎকণ্ঠা ও পক্ষ-বিপক্ষ মারমুখী অবস্থানে ছিল। ৫ ফেব্রুয়ারি ট্রাইব্যুনাল-২ জামায়াত নেতা কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করলে এর বিরুদ্ধে শাহবাগে আন্দোলন গড়ে ওঠে যা গণজাগরণ মঞ্চ নামে পরিচিতি পায়। সরকারও একপর্যায়ে সংসদে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন ১৯৭৩-এর সংশোধনী পাশ করে সরকার পক্ষের আপিলের ব্যবস্থা করে ও আপিলের প্রেক্ষিতে কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে আদালত ফাঁসির রায় প্রদান করে যা ১২ ডিসেম্বর কার্যকর হয়। এ ছাড়া জামায়াত নেতা গোলাম আজম, আলী আহসান মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মতিউর রহমান নিজামী, আবুল কালাম আজাদ, বিএনপি নেতা সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী, আব্দুল আলীম, বিলেত প্রবাসী চৌধুরী মইনুদ্দিন প্রভৃতির রায় প্রদান করা হয়েছে যা এখনও আপিল পর্যায়ে রয়েছে।

এসকল রায়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। এসব রায়ের প্রতিবাদে নিয়মিত অবরোধ ও হরতাল জারি ছিল। কেবল সাঈদীর রায়ের প্রতিবাদে সংঘটিত সহিংসতায় মারা যায় অন্তত ৮০জন। আবার গণজাগরণ মঞ্চের কর্মীরাও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সহিংসতার শিকার হন। বিচার কার্যক্রম নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রশ্ন তোলে ও শাস্তি মওকুফের দাবি জানায়।

১২ ডিসেম্বর লন্ডনের ইকনোমিস্ট পত্রিকায় ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি নিজামুল হক ও ব্রাসেলসের আহমেদ জিয়াউদ্দিনের মধ্যেকার স্কাইপ কথোপকোথন ও ইমেল ফাঁস হলে সরকার বিব্রত অবস্থায় পড়ে ও একপর্যায়ে নিজামুল হক পদত্যাগ করেন। বিচার কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তোলায় নিউএজ-এর সাংবাদিক ডেভিড

বার্গম্যান সরকার, আদালত ও গণজাগরণ মঞ্চের সমর্থকদের সমালোচনার মুখে পড়েন।

বিডিআর বিদ্রোহের রায়

বহুল আলোচিত বিডিআর বিদ্রোহের রায় ৫ নভেম্বর ঘোষণা করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন সেশন কোর্ট। এ রায়ে ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড, ১৫৯ জনকে আজীবন ও ২৩৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিআর বিদ্রোহে ৭৪ জন নিহত হন। যে পদ্ধতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন (গণবিচার) হয় তা নিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার নেভি পিল্লাই নিন্দা জানান। এছাড়া, বিচারাধীন অবস্থায় কারাগারে আটক প্রায় ৫০ জন বিডিআর জোয়ান মারা যান।

হেফাজতে ইসলাম

আল্লামা শফির নেতৃত্বাধীন হেফাজতে ইসলাম তাদের ১৩ দফা দাবি আদায়ে ৫ মে ঢাকার মতিঝিলে মহাসমাবেশ ডাকে। সমাবেশ শেষ করে তারা সেখানেই অবস্থান নেয়। গভীর রাতে র‍্যাব ও পুলিশ অভিযান চালায়। হেফাজতের সমাবেশ কেন্দ্রিক সহিংসতায় ২৪ জন নিহত হয় বলে পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়। এ সংখ্যা এইচআরডব্লিউ এর মতে আনুমানিক ৫০ জন যার মধ্যে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সদস্যরাও রয়েছেন। যদিও হেফাজত, বিএনপি ও অন্যান্যরা এ সংখ্যা অনেক বেশি বলে দাবি করেছে। ঘটনার রাতেই আন্দোলন সংবাদ প্রচারে নিয়োজিত দিগন্ত ও ইসলামিক টিভি- এই দুই টেলিভিশন চ্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হয়। 'বিভ্রান্তিকর' তথ্য প্রচারের অভিযোগে আগস্টে অধিকার'র সম্পাদক আদিলুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।

অজ্ঞাতনামা আসামি ও পুলিশের গ্রেফতার বাণিজ্য

২০১৩ সালে বছরজুড়ে চলা রাজনৈতিক সংঘাতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে 'অজ্ঞাতনামা, অজ্ঞাতসংখ্যক' শব্দগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। এই 'অজ্ঞাত' মানে যাকে জানা যায় নি। আর 'অজ্ঞাতসংখ্যক' হচ্ছে অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অসীম সংখ্যক অপরাধী। 'অজ্ঞাতনামা পরিচিতি' বা 'অজ্ঞাতসংখ্যক ব্যক্তি'-র ভয়াবহ দিক হচ্ছে এর অপব্যবহার। ঐ সময় রাজনৈতিক গোলযোগে বা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়ে হাজার হাজার অজ্ঞাতনামাকে আসামি করা হয়। এতে প্রকৃত অপরাধী ব্যক্তির পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক নিরপরাধ মানুষ নাজেহাল হয়। দেশের প্রধান প্রধান জাতীয় পত্রিকার অসংখ্য রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে, অজ্ঞাতনামা আসামিদের ধরতে

সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ছিল সবচাইতে আলোচিত। ... এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এ পর্যন্ত মামলার কোনো অগ্রগতি হয় নি।

দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গ্রেফতার বাণিজ্যের উৎসব চলছে। নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় বা অকারণে গ্রেফতার মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

সালিশ ও ফতোয়া

ফতোয়ার নামে বিচারবহির্ভূত শাস্তি প্রদান অসাংবিধানিক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বলে হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও বিগত বছরের মতো ২০১৩ সালেও ফতোয়া ও আইন বহির্ভূত সালিশের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অনেক নারী। ২০১৩ সালে সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে দেশে ২১ জন নারী নির্যাতনের শিকার হন।[৭]

সাংবাদিক নির্যাতন

২০১৩ সালে রাজনৈতিক সহিংসতার অন্যতম শিকার হন গণমাধ্যমের কর্মীরা। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর রোষানলে পড়ে হত্যা, নির্যাতন, সংবাদ সংগ্রহের মূল্যবান যন্ত্রপাতি নির্বিচারে ভাংচুর ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন হয়রানীর শিকার হতে হয়। সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ছিল সবচেয়ে আলোচিত। এ ব্যাপারে সরকার থেকে বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এ পর্যন্ত মামলার কোনো অগ্রগতি হয় নি। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাংবাদিক নির্যাতনের ওপর প্রকাশিত খবরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৩ সালে ৩ জন সাংবাদিক নিহত এবং অন্তত ২৮০ জন সংবাদকর্মী বিভিন্নভাবে বিভিন্নজনের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন। তার মধ্যে ৪৩ জন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা, ৫৬ জন সন্ত্রাসীদের দ্বারা, ১৪১ জন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা এবং হেফাজতে ইসলাম কর্তৃক ২৪ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হন। ৫ মে রাজধানীর পল্টনে পুলিশ ও হেফাজতের মধ্যে সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিতে আহত সাংবাদিক ফারহান পরবর্তীকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। ২১ নভেম্বর রাতে সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার পারুলিয়া বাজারে কুপিয়ে হত্যা করা হয় দৈনিক জন্মভূমির স্থানীয় প্রতিনিধি আবু রায়হানকে। ব্লগার আহমেদ রাজিব হায়দার ১৫ ফেব্রুয়ারি দুস্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হন। আবার ১৬ ফেব্রুয়ারি সরকার জামাত পরিচালিত সোনার বাংলা ব্লগটি বন্ধ করে দেয়। ১১ এপ্রিল দৈনিক আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করে এবং ১৪ এপ্রিল সংগ্রাম পত্রিকা অফিসে অভিযান চালায়।

অক্টোবরে সংসদে আইসিটি আইন পাশ হয় যাতে অপরাধের সংজ্ঞা এত বিস্তৃত করা হয়েছে যার ফলে সরকার ইচ্ছা করলেই যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে যা আবার অজামিনযোগ্য।

রানা প্লাজা ট্রাজেডি ও শ্রমিক অধিকার

দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ভবন ধসের ঘটনা ঘটে গত ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা নামক ভবনটি ধসে পড়ার মধ্য দিয়ে। দুর্ঘটনার সময় ঐ ভবনে মোট ৫টি তৈরি পোশাক কারখানায় সহস্রাধিক পোশাককর্মী কর্মরত ছিল। আগের দিন ফাটল দেখার পরেও ভবন মালিক ও কারখানা মালিকদের হুমকি ও চাকুরি হারানোর ভয়ে শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়। ঐ ঘটনায় প্রাণ হারায় এক হাজার ১৩৫ জন পোশাক শ্রমিক। এর মধ্যে ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধার করা হয় এক হাজার ১১৫টি মৃতদেহ, জীবিত উদ্ধার দুই হাজার ৪৩৮ জনের মধ্যে মারা যান আরো ১৬ জন। গুরুতর আহত ও অঙ্গহানিদের মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে হয় হাসপাতালের বিছানায় যাদের অনেককেই বাকি জীবন পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। ঘটনার সাতমাস পর গত ডিসেম্বরে ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধার হয় দুটি খুলি।

১৫ই জুলাই সংসদে শ্রম আইন সংশোধিত হয়েছে, যেখানে আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর যথাক্রমে সংগঠনের স্বাধীনতা এবং সংগঠন ও দর কষাকষির স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়েছে। এরই জের ধরে বাংলাদেশের পণ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) যুক্তরাষ্ট্র স্থগিত করে। শ্রমিকের রক্তমাখা পোশাক না কেনার হুমকি দেয় বিভিন্ন দেশের ক্রেতারা। দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা মালিকপক্ষের ক্ষতিপূরণের অর্থপ্রাপ্তির আশায় এখনও দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। ক্ষতিপূরণের অর্থপ্রদান নিয়ে চলছে নানা তালবাহানা।

সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতন এবং ভারতের বৈরি আচরণ

বাংলাদেশ ও ভারত– দু'দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা, প্রটোকল স্বাক্ষর, সীমান্ত হত্যাকাণ্ড বন্ধে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না সীমান্ত হত্যাকাণ্ড। ভারতের সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী বিএসএফ-এর গুলিতে অনেক নিরীহ বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়। ২০১৩ সালে সীমান্তে হত্যা ও নির্যাতনসহ ৩৩৫টি ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে হত্যার শিকার ২৬ জন, শারীরিক নির্যাতনে আহত ৮৪ জন এবং অপহরণের শিকার ১৭৫ জন। ২০১১ বিএসএফ-এর হাতে নিহত ফেলানী হত্যা মামলার রায়ে অভিযুক্ত ভারতীয় জোয়ান অমিয় ঘোষকে সে দেশের জেনারেল সিকিউরিটি ফোর্সেস কোর্ট বেকসুর

খালাস দিলে বাংলাদেশে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে ভারতের সাথে দরকষাকষিতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে ফলে পানি বণ্টন চুক্তি করা সম্ভব হয়নি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে। স্থল পরিবহন চুক্তির আওতায় ভারত তাদের সেভেন সিস্টার্সসের সাথে বাংলাদেশের স্থলপথ ব্যবহার করার বন্দোবস্ত পাকা করতে সক্ষম হয়েছে। আবার সুন্দরবনে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ধ্বংস করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপনে ভারতের সরাসরি স্বার্থ জড়িত রয়েছে।

সংখ্যালঘু নির্যাতন

দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নিপীড়নের কোনো প্রতিকার হচ্ছে না। নির্যাতনের ঘটনা ঘটার পর সরকারপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করার ফলে এসব হামলার ঘটনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে মামলা করে আরও রোষানলে পড়া ছাড়া কোনো ফল হবে না ভেবে ভুক্তভোগীরা মামলা করতেও উৎসাহী নয়। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী রানা দাশগুপ্ত বলেন, 'ন্যায়বিচার না পাওয়া ও অভিযোগ করলে পরে আরও বড় হামলা নির্যাতন হবে– এ ভয় থেকেই অনেকে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন না। সংখ্যালঘুদের জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

২০১৩ সালে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন। এ বছর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায়কে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতন; বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়, বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ভাংচুর, শারীরিক নির্যাতন, অগ্নিসংযোগসহ লুটপাট ও চাঁদাবাজির অসংখ্য ঘটনা ঘটে। এগুলোর অধিকাংশই সম্পন্ন হয় মৌলবাদী গোষ্ঠী ও জামায়াত শিবিরের দ্বারা। তবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও প্রধান বিরোধী দলের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধেও এসব ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন- ২০১৩ সালের ১ এপ্রিল টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরের কালীমন্দিরে সংগঠিত তাণ্ডবের বিরুদ্ধে স্থানীয় যুবলীগের আহ্বায়ক এবং বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের নামে মন্দির কমিটির সভাপতি মামলা দায়ের করেছেন। ২৮ মে ২০১৩ কুমিল্লার ঠাকুরপাড়ায় একটি বৌদ্ধ পরিবারের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় স্থানীয় কৃষক লীগের সহ-সভাপতিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।[৮] আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদনে বলা হয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় দায়িত্বশীল পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় নি। বিভিন্ন সময় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার আশঙ্কার বিষয় আগে থেকে আঁচ করা গেলেও কর্তৃপক্ষ আগাম সতর্কতামূলক কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে হামলাকারীরা নির্বিঘ্নে এতো সহিংস ঘটনা ঘটাতে পেরেছে। এ বছরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ২৭৮টি বাড়িঘরে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ, ২০৮টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাট এবং ৪৯৫টি উপাসনালয়ে হামলা করে প্রতিমা ভাংচুর করেছে। এ ছাড়া আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের উপরও হামলা নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটে।

আদিবাসীদের মানবাধিকার

কাপেং ফাউন্ডেশনের রিপোর্টে[৯] দেখা যাচ্ছে, ২০১২ সালের চেয়ে ২০১৩ সালে আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কমপক্ষে ৩ হাজার ৭৫ একর আদিবাসীদের জমি ভূমিদস্যুরা গ্রাস করে নিয়েছে, ২৬টি পরিবার বাস্তুচ্যুত ও ১ হাজার ১১৮ পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ৭ জনকে হত্যা ও ৩৬ জনকে অবৈধভাবে আটক করা হয়েছে। ১২৩ জনকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। পাহাড়ে বাঙালি বসতি স্থাপনকারী ও ভূমিদস্যুরা ৩৪৬টি আদিবাসী বাড়িঘর ভাংচুর করেছে যার ফলে কমপক্ষে দুই হাজার আদিবাসী ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এছাড়াও কমপক্ষে ৬৭জন নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়েছেন। আদিবাসীদের অভিযোগ, নিরাপত্তা বাহিনী, ফরেস্ট গার্ড, বাঙালি বসতি স্থাপনকারী, ভূমিদস্যু, স্থানীয় প্রশাসন ও প্রাইভেট কোম্পানি কর্তৃক আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

দলিত মানবাধিকার

বাংলাদেশে দলিতদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র ইদানীংকালে পত্রপত্রিকায় প্রায়শ প্রকাশিত হচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে অস্পৃশ্যতা ও দারিদ্রের কারণে অতিপ্রান্তিক দলিতদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র। ২০১৩ সালের ২১ জুলাই জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নে দুলাল চন্দ্র রবিদাসের ওপর হামলা চালায় ইউপি সদস্য হেলাল মণ্ডল ও তার

সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার সকলের আর তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন সরকারের। কোনো অজুহাত দেখিয়ে সরকার তা অস্বীকার করতে পারে না।

সাঙ্গপাঙ্গরা। আক্রমণে দুলালের মাড়ির দাঁত ভেঙ্গে যায় ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ২০১৩ সালের ২৭ মে নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার পাহাড়পুর পুলিশফাঁড়ির কয়েকজন পুলিশ সদস্য রঘুনাথ বুনাকে তার সেলুন থেকে ধরে নিয়ে মাদকাসক্তির সাথে জড়িত রয়েছে- এই মর্মে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য তার ওপর নির্যাতন চালিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখম করে। এ বিষয়ে থানায় কোনো মামলা বা সাধারণ ডায়েরি রুজু করা হয়নি। ২৮ জুন, ২০১৩ তারিখে পিরোজপুরের শারিকতলা-ডুমরিতলা ইউনিয়নের গুয়াবাড়িয়া গ্রামের স্বপন দাসের মেয়ে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা করে। হত্যাকারীরা তাকে পাশের এক ডোবায় ফেলে রেখে যায়। ভোলায় হোসাইন কবির পান্থ নামের এক যুবক মোবাইল সংক্রান্ত বিষয়ে তার বন্ধুদের সাথে বিরোধের ফলে নিহত হলে পুলিশ দলিত সম্প্রদায়ের সুমন মুচি, সংকোজ কর্মকার, কৃষ্ণ মুচি ও রাজিব কর্মকারকে গ্রেফতার করে। ৪ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে জয়পুরহাটের দলিত আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের ওপর নির্যাতন, জুলুম, ধর্ষণ, ভূমিদখল ও মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রতিবাদে দূর্গাপুর বাজার থেকে পদযাত্রা করে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। এরপর তারা জয়পুরহাট আইনজীবী ভবনের কাছে এক হোটেলে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে। তারা দলিত সম্প্রদায়ের লোক জানাজানি হলে, হোটেলের মালিক তাদের ব্যবহৃত থালা ও গ্লাসের দাম দাবি করে। ১০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়া রেল স্টেশনের দলিত কলোনির বাসিন্দা রাজেশ বাঁশফোর স্টেশন সংলগ্ন মো. দেলোয়ার হোসেনের হোটেল থেকে পরোটা কিনতে গেলে তার কাছে বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ নিয়ে রাজেশ প্রতিবাদ করলে হোটেল মালিক, পাশের হোটেল ও দোকানদাররা রাজেশকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয় ও মারধর করে। বীরবল হরিজন (৫৫) দুর্ঘটনায় পা ভেঙ্গে গেলে চাঁদপুর সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে চিকিৎসা না দিয়ে বেড থেকে নামিয়ে টয়লেটের পাশে ফেলে রাখে[১০]। পটুয়াখালীর কলাপাড়া পৌরশহরে ২৯ জুন স্ত্রীকে উত্যক্তের প্রতিবাদ করলে স্বামী রতন রিশিকে কুপিয়ে জখম করেছে রাজিব, মুজাম্মেল ও রুবেলের নেতৃত্বে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। পরে রতনকে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে[১১]।

বিশ্বের ১০ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের তালিকায় বাংলাদেশ

সংঘাতের আশঙ্কা করে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের তালিকায় বাংলাদেশকে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী 'ফরেন পলিসি'। আর মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭ তম।[১২] এসব অঞ্চলে সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণে বিশ্বের স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়তে পারে বলেও তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। গত ৩০ ডিসেম্বর সাময়িকীটির অনলাইন সংস্করণে 'নেক্সট ইয়ার্স ওয়ারস/ ফ্রম সোচি টু সুদান, টেন কনফ্লিক্টস দ্যাট উইল থ্রেটেন গ্লোবাল স্ট্যাবিলিটি ইন ২০১৪' শিরোনামের প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে নিয়ে এ আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করা হয়। ২০১৩ সালে অস্থিতিশীল দেশ বা অঞ্চলের তালিকায় বাংলাদেশ, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, হন্ডুরাস, লিবিয়া ও নর্থ ককেশাসকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সম্ভাব্য সংঘাতপূর্ণ অন্যান্য অঞ্চল ও দেশের মতো বাংলাদেশকে নিয়েও একটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরা হয়।

শেষকথা

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোনো মানদণ্ডেই বাংলাদেশের মানবাধিকার সন্তোষজনক নয়। সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার সকলের আর তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন সরকারের। কোনো অজুহাত দেখিয়ে সরকার তা অস্বীকার করতে পারে না। ফলে সরকারকেই সাধারণ মানুষের মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে।

মাজহারুল ইসলাম : গবেষক ও মানবাধিকার কর্মী।
mazhar1971@yahoo.com

ড. মিজানুর রহমান নাসিম : শিক্ষক ও সমাজ-সংস্কৃতি গবেষক।
mizanrah68@gmail.com

তথ্যসূত্র :

১ শরিফুল হাসান, 'হত্যার রাজনীতি, লাশের মিছিল', দৈনিক প্রথম আলো, নভেম্বর ৫, ২০১৩
২ C R Abrar, Year of shrinking democratic space, violence and disenfranchisement.
৩ এফবিসিসিআই রিপোর্ট, -মিরাজ শামস, দৈনিক সমকাল, ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃ.১৩
৪ জুলকার নাইন, বৈদেশিক সম্পর্কে স্থবিরতা, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৩
৫ সালমা খান, 'সম্মিলিত প্রতিরোধ চাই'
৬ আইন ও সালিশ কেন্দ্রর প্রতিবেদন, ২০১৩
৭ প্রাগুক্ত
৮ C R Abrar, Year of shrinking democratic space, violence and disenfranchisement.
৯ http://www.newagebd.com/detail.php?date=2014-02-26&nid=85204#.UzFkSIU9DHt
১০ দৈনিক আলোকিত চাঁদপুর, ২ মার্চ ২০১৩
১১ জনকণ্ঠ ১ জুলাই ২০১৩
১২ দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৩।

২০১৩ সালে প্রণীত ও সংশোধিত আইনের প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা

এ্যাডভোকেট শামিম আল মামুন

রাজনৈতিক অস্থিরতা-সংঘর্ষ এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতির ডামাডোলেও ২০১৩ সালে দেশে বেশ কয়েকটি আইন প্রণীত হয়েছে। এগুলোর কোনোটি জনহিতকর, আবার কোনোটি জনস্বার্থবিরোধী। একদিকে যেমন পিতামাতার ভরণপোষণ আইন, নিরাপদ খাদ্য আইন, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, জাতীয় নদী রক্ষা আইন-এর মতো জনহিতকর আইন প্রণীত হয়েছে, তেমনি তথ্য-প্রযুক্তি আইনের মতো কালো আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

পিতামাতার ভরণপোষণ আইন-২০১৩

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার সুহিলপুর গ্রামের লিয়াকত আলী (৬০) নিজের সহায় সম্বল বিক্রি করে ছেলে ইয়াছিন রানাকে দুবাইয়ে পাঠান। কিন্তু রানার স্ত্রী রাশিদা আক্তার রিতা, শ্বশুর শেখ বাদল, শ্বাশুড়ি লুৎফা বেগম ও শ্যালক সোহেলের প্ররোচনায় রানা তার নিজের বাবা-মাকে টাকা না পাঠিয়ে শ্বশুর বাড়িতে স্ত্রীর নামে টাকা পাঠাতে থাকেন। বাবা লিয়াকত আলী পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন-২০১৩ এর আওতায় ভরণপোষণ না দেওয়ার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে চাঁদপুরের প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন। আদালত সকল আসামিকে হাজির হতে নির্দেশ দেন। আসামিগণ হাজির হয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক ভরণপোষণ প্রদানের অঙ্গীকার করলে আদালত তা মঞ্জুর করে। এটিই ভরণপোষণ আইনের প্রথম মামলা। পিতামাতার ভরণপোষণ আইন-২০১৩ পাশের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ একটি মানবিক দায়িত্ব পালন করেছে। আর্থিক ও সামাজিক কারণে আমাদের সমাজে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যরা অবহেলায় শিকার হচ্ছেন এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মীয়, পারিবারিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সন্তানরা যে দায়িত্ব পালন করার কথা তা পালন করছেন না।

এক্ষেত্রে আইনটি পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য একটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারে। পিতামাতার ভরণপোষণ আইন-২০১৩ এর ০৩ ধারা অনুযায়ী, একক সন্তান একাই এবং একাধিক সন্তানের ক্ষেত্রে সবাই আলোচনা করে ভরণপোষণ নিশ্চিত করবে এবং চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবার ব্যবস্থা করবে। এক্ষেত্রে একটি কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পিতামাতাকে সন্তানের সাথে একই স্থানে বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো যাবে না। যদি কোনো একান্ত কারণে একইসাথে রাখা সম্ভব না হয় তবে তাদের নিয়মিত যুক্তিসঙ্গত ভরণপোষণ প্রদানের পাশাপাশি নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে হবে। আইনটির সবচেয়ে বাস্তবমুখী দিক হলো পিতার অবর্তমানে দাদা-দাদী এবং মাতার অবর্তমানে নানা-নানীর ভরণপোষণের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বড় বাধা হলো পিতামাতার ভরণপোষণ আইন-২০১৩ এর ৭ (২) ধারা। এই ধারার বিধান অনুযায়ী, কোনো আদালত এই আইনের অধীন সংগঠিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট সন্তানের পিতা বা মাতার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত আমলে গ্রহণ করবে না। এক্ষেত্রে পুরো বিষয়টি আদালতের উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। কারণ, এই ধারার অজুহাতে নানা-নানী বা দাদা-দাদীর মামলা আদালতে গৃহীত নাও হতে পারে বা বিবাদী পক্ষ মামলা গৃহীত হলেও সেটাকে বড় অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে পারে।

পিতামাতার ভরণপোষণ আইনের অধীনে কৃত সকল অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য, আপোষযোগ্য এবং ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য। আদালত চাইলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা সদস্য বা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলরের কাছে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য পাঠাতে পারবেন। আপোষ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরিত উপযুক্ত ব্যক্তি উভয়পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন এবং তা আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত বলে গণ্য হবে।

আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী পিতামাতা বা তাদের অবর্তমানে যথাক্রমে দাদা-দাদী বা নানা-নানীর ভরণপোষণ প্রদান না করলে অনুর্ধ্ব ১ লাখ টাকা জরিমানা বা উক্ত অর্থদণ্ড অনাদায়ের ক্ষেত্রে অনুর্ধ্ব ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এক্ষেত্রে যদি কেউ পিতামাতার ভরণপোষণ প্রদানে অসহযোগিতা/ বাধা/ না দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেন তিনিও একই দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

আইনটি সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে আইনটির এতোসব ভালো দিক সত্ত্বেও যদি কোনো সন্তান তার পিতামাতার ভরণপোষণ দিতে না চায়, তাহলে তা আদায় করা কঠিন হবে। কারণ ৭(২) নং ধারা অনুযায়ী, পিতামাতার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত আদালত এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ আমলে নিবেন না। সেক্ষেত্রে বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতার মামলা করার মতো শারীরিক সক্ষমতা নাও থাকতে পারে।

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে থাকলেও সন্তানের বিরুদ্ধে তারা এ ধরনের কোনো অভিযোগ করতে চান না। অন্যদিকে বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘসূত্রিতার কারণেও মামলা করে ভরণপোষণ আদায় করা তাদের জন্য কঠিন। এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আইনটি একটি মানবিক ও ভালো আইন হলেও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন বা বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনের মতো অনেকটা অকার্যকর ও কাজীর গরুর মতো শুধু কেতাবি আইন হিসেবে পর্যবসিত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

শিশু আইন, ২০১৩

'ঘরের ভেতরে আটকাই ধরি মাইরিছে, কুরআন নিয়ে আল্লাহর দোহায় দিইছি। তাও চুল ধইরি মারিছে। খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দিছে, ব্যাট দিয়ে মারিছে, তারপর ঘাড় ধরি রাইত ১২টা সমত ঘর থেকি বাইর করি দিছে'। এভাবেই নির্যাতনের বর্ণনা দেন শিশু রাজিয়া খাতুন ওরফে রানু। ২০১৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় চুরির অপবাদ দিয়ে এভাবেই তাকে নির্যাতন করা হয় (দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩)।

শিশু আইন-২০১৩ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি তাঁর দায়িত্বে থাকা কোনো শিশুকে নির্যাতন করলে অনধিক পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। শিশু আইন-২০১৩ শিশুর বয়স নির্ধারণ ও শিশুদের প্রতি কৃত সকল অপরাধের জন্য একটি বিশেষ রক্ষাকবচ। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতন ছিল ২০১৩ সালের অহরহ ঘটনা। এছাড়াও শতাধিক শিশু হত্যাসহ নির্যাতনের শিকার হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিশু আইন-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। শিশু আইন-২০১৩ এর ৪ ধারা অনুযায়ী, শিশু বলতে ১৮ বছর পর্যন্ত সকলকেই শিশু হিসাবে গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে, ছেলে-মেয়ে যাই হোক না কেন, ১৮ এর কমবয়সী সবাই শিশু বলে গণ্য হবে। শিশু আইন অনুযায়ী প্রতিটি থানায় একজন সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার কর্মকর্তার দায়িত্বে একটি শিশু অধিকার ডেস্ক থাকবে এবং কোনো প্রবেশন কর্মকর্তার মাধ্যমে শিশুর সর্বোচ্চ কল্যাণ এবং মৌলিক চাহিদাসহ শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

শিশু আইন, ২০১৩-এর ১৬ ধারায় বলা হয়েছে, আইন ও বিচার বিভাগ, সুপ্রিম কোর্ট-এর সাথে পরামর্শক্রমে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার শিশু আদালত নামে আদালত প্রতিষ্ঠা করবে। এক বা একাধিক অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতকে শিশু আদালত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, একাধিক আদালত নির্ধারণ করা হলে প্রত্যেকটির আঞ্চলিক এখতিয়ার নির্দিষ্ট থাকবে, কোনো জেলায় অতিরিক্ত দায়রা জজ না থাকলে জেলা ও দায়রা জজ তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে শিশু আদালতের দায়িত্ব পালন করবেন। শিশু আদালতের পরিবেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আইনজীবী, পুলিশ বা আদালতের কোনো কর্মচারি আদালতকক্ষে পেশাগত বা দাপ্তরিক ইউনিফরম পরে উপস্থিত হবে না। এছাড়া, অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ড প্রদান করা যাবে না। ৪৪ ধারায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে, ৯ বৎসরের নিচের কোনো শিশুকে কোনো অবস্থাতেই গ্রেফতার করা বা আটক রাখা যাবে না বা নিবর্তনমূলক আদেশ সংক্রান্ত কোনো আইনের অধীন গ্রেফতার বা আটক করা যাবে না।

ধারা ৩৪ (১) এর বিধান অনুযায়ী কোনো শিশু মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলে শিশু-আদালত অনুর্ধ্ব ১০ বছর এবং অন্যূন ৩ বছর মেয়াদে আটকাদেশ প্রদান করে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখার আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

শিশু আইন-২০১৩ অনুযায়ী শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার বা শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার বা শিশুকে অসৎ পথে পরিচালনা করার শাস্তি ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড এবং শিশুকে মাদক/আগ্নেয়াস্ত্র/বিপদজ্জনক ঔষধ প্রদান বা বহন করানোর শাস্তি ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড। এছাড়াও শিশুকে বাজি ধরতে উৎসাহ প্রদান বা যৌনপল্লীতে থাকার অনুমতি প্রদান বা শিশুকে শোষণ করার শাস্তি ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

শিশু আইন-২০১৩ বাংলাদেশে শিশু অধিকার রক্ষায় একটি মাইলফলক। কিন্তু আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় রয়েছে। এখনো অনেকভাবে শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, কোনো রকম প্রতিকার মিলছে না।

নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩

১৯ এপ্রিল, ২০১৩ সোনারগাঁয়ের পিরোজপুর ইউনিয়নের শামিমকে কোনো একটি হত্যার ঘটনায় জড়িত হিসেবে আটক করে পুলিশ। ছয়দিন ধরে পুলিশি

নির্যাতনের শিকার হয়ে চরম অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে শামিম মারা যায়। পুলিশ প্রতিবেদনে, শামিমের দুই পা, হাঁটু, কোমর, হাত, মুখমণ্ডলে জখমসহ কালো দাগ পাওয়া যায়। এছাড়া তদন্ত কমিটির তদন্তে বিষয়টির সত্যতা পাওয়া যায়। এ ঘটনায় পুলিশ পরিদর্শক অরূপ তরফদার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতিকুর রহমান ও সহকারি পুলিশ সুপার-এর বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক ব্যবহার বা লাঞ্ছনাকর দণ্ডবিরোধী সনদে স্বাক্ষর করে। অধিকন্তু বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সকল প্রকার নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক ব্যবহার বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে হেফাজতে থাকাকালীন হত্যাসহ নানামুখী শারীরিক ও মানসিক এবং যৌন নির্যাতন এর অভিযোগ রয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশনা, সনদে স্বাক্ষর, অব্যাহত নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ নামে একটি আইন সরকার ২৭ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে পাশ করে।

এই আইন অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি আদালতে এসে অভিযোগ করে যে, তাকে নির্যাতন করা হয়েছে, তবে আদালত উক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষার নির্দেশ প্রদান পূর্বক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করার নির্দেশ দিবেন এবং চিকিৎসক তা পালন করে এক কপি রিপোর্ট আদালতে এবং এক কপি বাদীকে প্রদান করবেন। প্রয়োজনে আদালত মহিলা চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষার নির্দেশ দিবেন এবং হাসপাতালে ভর্তির নির্দেশসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসার নির্দেশ দিবেন। আদালত বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে পুলিশ সুপার বা তদুর্দ্ধ কর্মকর্তার নিকট তদন্তের জন্য প্রেরণ করবেন। উক্ত কর্মকর্তা চার্জ বা চার্জবিহীন রিপোর্ট পেশ করবেন। আদালত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি সমন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে নিজে বা আইনজীবী মারফত আদালত আপত্তি জানাতে পারবেন। প্রয়োজনবোধে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির চলাচল নির্দিষ্টকরণ এবং বাদীর নিরাপত্তা গ্রহণ করার নির্দেশ দান করবেন।

নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী, এই আইনের অধীনে কৃত সকল অপরাধের বিচার জেলা দায়রা জজ আদালতে বিচার্য হবে এবং ১৮০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। তবে যুক্তিসংগত কারণে তা ৩০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়া প্রথম লিপিবদ্ধ করার তারিখের ৯০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে বলা হয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে আটক কোনো ব্যক্তির নির্যাতনের ফলে মৃত্যু হলে দোষী ব্যক্তি অন্যূন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অতিরিক্ত দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হেফাজতে নির্যাতনের জন্য সর্বনিম্ন শাস্তি পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড। নির্যাতনে প্ররোচিত বা সহায়তা করলেও দুই বছরের কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান করা হয়েছে। কোনো সরকারি কর্মকর্তা অথবা তার পক্ষে কর্তব্যরত কোনো ব্যক্তির গাফিলতি বা অসর্তকতার কারণে অভিযোগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রমাণ করতে হবে যে, তার বা তার পক্ষে কর্তব্যরত ব্যক্তির গাফিলতি বা অসর্তকতার কারণে ঐ ক্ষতি হয় নাই। যুদ্ধাবস্থা, যুদ্ধের হুমকি, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অথবা জরুরি অবস্থা বা সরকারি আদেশে নির্যাতনের অজুহাত অগ্রহণযোগ্য হবে। আমাদের দেশে পুলিশসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অহরহ নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যায়। গত কয়েক বছর ধরে এ ধরনের অভিযোগের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র এ ধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ব্যবস্থা নেয় না। তাই, এসব অপরাধের জন্য এটি চমৎকার একটি আইন হলেও আইনটির যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় থেকে যায়।

আমাদের দেশে পুলিশসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অহরহ নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যায়। গত কয়েক বছর ধরে এ ধরনের অভিযোগের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) (সংশোধন) আইন, ২০১৩

বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা অধিকার-এর সম্পাদক আদিলুর রহমানকে বিকৃত তথ্য পরিবেশনের অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ। এছাড়াও ফেসবুকে পাওয়া বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতির তথ্য প্রকাশের দায়ে দৈনিক ইনকিলাব বন্ধ করে দেয় সরকার। নিঃসন্দেহে তথ্য যাচাই করে পরিবেশন না করা অপরাধ এবং দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক। তাই বলে প্রতিষ্ঠানের সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। পত্রিকা বন্ধের ফলে এর সাথে জড়িত সকলের বেতন বন্ধ হয়ে যায়। এটি অমানবিক।

বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। অধিকতর সত্যতা ও জবাবদিহিতাসহ সার্বিক কার্যক্রমকে গতিশীল তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নাই। তথ্য প্রযুক্তি পরিণত হয়েছে একটি

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মেরুদণ্ড হিসাবে। সময়ের সাথে সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ সর্বত্র ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও এর ব্যবহার ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের সুষ্ঠু ও সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির সুফল পাওয়া যাবে। বিশ্বের কোথাও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারবিহীন ভবিষ্যৎ অকল্পনীয়। দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ও বহুল মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে কিছু শর্ত সাপেক্ষে নাগরিকদের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সংশোধিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের কারণে নাগরিকদের চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হবে।

আইনে আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীকে যেকোনো ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেফতার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে সর্বনিম্ন ৭ বছর ও সর্বোচ্চ ১৪ বছর কারাদণ্ড করা হয়েছে। সেই সাথে এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা রাখার বিধান রাখা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি এই আইনের অধীনে অপরাধ করে তাহলে তার সর্বনিম্ন ৭ বছর এবং সর্বোচ্চ ১৪ বছর কারাদণ্ড এবং এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। এতদিন পর্যন্ত এই আইনের অধীনে অপরাধগুলো জামিনযোগ্য ছিল। তবে বর্তমান সংশোধিত আইনে অপরাধগুলো অজামিনযোগ্য করা হয়েছে। আইনের ৫৪, ৫৫, ৫৭ ও ৬১ ধারাগুলো মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যও হুমকিস্বরূপ, যা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিরও লঙ্ঘন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) (সংশোধন) আইন, ২০১৩ -এ তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে

পুলিশকে ৪টি সুনির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট ছাড়াই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং এসব অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধ জামিন অযোগ্য করা হয়েছে। আগের আইনে (২০০৬ সালের ৩৯নং আইনে) সব অপরাধ জামিনযোগ্য ছিল। অ-ধর্তব্য অপরাধ হওয়ার আগে পুলিশের মামলা করতে হলে আদালতের/ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হতো। এখন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাগবে না। অর্থাৎ সংশোধিত আইনে পুলিশ সরাসরি মামলা করতে, মামলা নিতে এবং বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করতে পারবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের মূল সমস্যা (প্রতিবন্ধকতা) হচ্ছে ৫৭ ধারা। আগের আইনে সর্বোচ্চ সাজার বিষয়টি উল্লেখ ছিল। কিন্তু ন্যূনতম সাজার বিষয়টি ছিল না। ফেসবুকে কারো দেওয়া স্ট্যাটাসের ফলে মানহানি হলে মানহানির পরিমাণ অনুযায়ী সেই পরিমাণ শাস্তি হতে পারতো। মানহানি কতটুকু হয়েছে তা আদালতের বিচার্য বিষয়। কিন্তু এই আইনে ন্যূনতম সাজা ৭ বছর উল্লেখ করে দিয়ে আদালতের হাত, পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কারণ কাউকে যদি সাজা দেওয়া হয়, তাহলে তাকে ৭ বছর সাজা দিতে হবে। নূন্যতম সাজার বিধান করে নাগরিকদের এক ধরনের অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সংশোধিত এই আইনে পুলিশকে সরাসরি মামলা করায় ও পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার করা ক্ষমতা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের পেনাল কোডে অপরাধের সংজ্ঞা এমনভাবে দেওয়া হয় যেন অপরাধ করার আগেই একজন মানুষ বুঝতে পারে কী কী করলে তা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। উদাহরণস্বরূপ পেনাল কোডের ১৭৭ ধারার কথা বলা যেতে পারে, যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য দেওয়া বলতে ঠিক কী বুঝানো হয়েছে, তা স্পষ্ট করে শুধু বলাই হয়নি, দুইটি উদাহরণ দিয়ে তার স্বরূপও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু আইসিটি আইনের ৫৭(১) অনুচ্ছেদে অপরাধের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা একেবারেই স্পষ্ট নয় এবং অভিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন লেখকের পক্ষেই বোঝা সম্ভব না যে কী লিখলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে। সাধারণত কোনো ব্যক্তিকে অপরাধ প্রমাণ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে নির্দোষ বলে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির নামে যে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করবে তাকে হয়রানি করা সম্ভব। অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ধারাগুলো আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য করে দেওয়ায় একজন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কার্যত তাকে দোষী হিসাবে আটক থাকতে হবে। যা মানবাধিকারের স্বাভাবিক নিয়মনীতির পরিপন্থি। তথ্য প্রকাশের কথিত অপরাধকে বিচারের আগে অজামিনযোগ্য করে আদালতের ক্ষমতাকে স্পষ্টত একটি সীমারেখায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আদালত চাইলেও কম শাস্তি দিতে পারবে না। এতে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

যেমন- চুরির শাস্তি ৩ বছর জেল। এখন কাউকে যদি এভাবে শর্ত দেওয়া হয় যে, চুরির সর্বনিম্ন শাস্তি ৩ বছর জেল, তবে আদালত চাইলেও তিন বছরের কম শাস্তি দিতে পারবে না। কেউ যদি জুতা চুরি করে তবে তার শাস্তিও সিদ কেটে গয়না চুরির মতো তিন বছর জেল হবে। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর শোনালেও ভুক্তভোগীদের কাছে আতঙ্কস্বরূপ। এভাবে লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করে শাস্তির স্বাভাবিক নিয়মকেও বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেমন- যদি কোনো দাঙ্গায় যোগ দিয়ে সরাসরি কোনো সহিংসতায় অংশগ্রহণ করা হয়, তাহলে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৪৮ ধারা অনুসারে সর্বোচ্চ শাস্তি হবে তিন বছর জেল। (সর্বনিম্ন শাস্তি আদালত নির্ধারণ করবে) কিন্তু যদি ওয়েবসাইটে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এমনকিছু প্রকাশ করা হয়, যা থেকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আইসিটি আইন অনুসারে শাস্তি হবে সর্বনিম্ন ৭ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১৪ বছরের জেল বা অনধিক কোটি টাকা জরিমানা হবে।

এ আইনে অপরাধের সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন করা হয়নি বা, কোন কোন কাজ অপরাধ হবে তাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। এতে মৌলিক অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হবে এবং দেশের গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ব্যাহত হবে, যা সংবিধানের মূল প্রস্তাবনা এবং তৃতীয় অংশের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তার বিকাশে এ ধরনের মৌলিক অধিকার পরিপন্থি বিধান যত দ্রুত বাতিল করা হবে ততই মঙ্গল। আইনটি তথ্য অধিকার আইনের সাথেও সাংঘর্ষিক। এ আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকেও সংকীর্ণ করবে। এ কথাও সত্য যে, ইন্টারনেটভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেরও জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আবার একই সাথে কেউ

যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতা চর্চা করতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে অপরাধ করে, তাহলে তার শাস্তি অবশ্যই হওয়া উচিৎ। সেজন্য একটি আইন অবশ্যই থাকা উচিৎ। তবে আইনটি কালাকানুন হলে চলবে না। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন সংশোধন করা জরুরি প্রয়োজন। বাংলাদেশের সংবিধানে তথ্য ও সংবাদক্ষেত্রের যে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন তার চেতনার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটা মৌলিক অধিকার হিসাবে সংবিধানে স্বীকৃত, তাই আইনটা এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

২০১৩ সালের ১৭ অক্টোবর প্রাণ কোম্পানির ৪০০ গ্রাম গুঁড়া হলুদের প্যাকেটে ৪৮ পিপিএম মাত্রার সিসা খুঁজে পেয়েছে এফডিএ। এরই প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাণের গুঁড়া হলুদ বাজার থেকে তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেয় প্রতিষ্ঠানটি। উচ্চমাত্রার সিসা, কমবয়সী শিশু ও নবজাতকের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। এর ফলে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

নিরাপদ খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ পাস করা হয়েছে। এ আইনের অধীনে একজন চেয়ারম্যান ও পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে।

নিরাপদ খাদ্য আইনে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য বা তার উপাদান ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কেউ তা অমান্য করলে অমান্যকারীর জন্য সর্বোচ্চ ৫ বছর কারাদণ্ড ও ১০ লাখ টাকা জরিমানা এবং অন্যূন ৪ বছর কারাদণ্ড বা ৫ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। এছাড়া দোকান বা কারখানা বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির যন্ত্রপাতি বা তৈরির উপাদান বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। এই আইনে ১৩ ধরনের অপরাধকে আমলযোগ্য বা বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও অজামিনযোগ্য করা হয়েছে। এই আইনের বাস্তবায়নের জন্য খাদ্য আদালত নামে বিশেষ আদালত নির্দিষ্ট এলাকার ক্ষমতা দিয়ে গঠিত হবে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দিনে বা রাতে যে কোনো সময় অপরাধীকে গ্রেফতার করার জন্য পরোয়ানা জারি করতে পারবে। অভিযোগকারী বা খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক অভিযোগ দায়ের করার ৯০ দিনের মধ্যে অভিযোগপত্র দাখিল করা না হলে মামলাটি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হবে এবং তারা এ অপরাধের জন্য তদন্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। নিরাপদ খাদ্য আইনের মামলায় কোনো ব্যক্তি অপরাধী প্রমাণিত হলে এবং অর্থ জরিমানা করলে, অভিযোগকারী উক্ত অর্থের ২৫ শতাংশ

পাবেন। তবে তিনি সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করলে তা পাবেন না।

নিরাপদ খাদ্য আইনে কোনো ব্যক্তি ফৌজদারি দণ্ড পেলেও তার বিরুদ্ধে দেওয়ানি প্রতিকার দাবি করা যাবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যদি আর্থিক ক্ষতি নিরূপণযোগ্য হয়, তবে উক্ত অর্থের অনুর্ধ্ব ৫ গুণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন।

সার্বিকভাবে আইনটি একটি কার্যকরী আইন হলেও মূল অপরাধের ধারা ৪৪-কে আপোষযোগ্য করা হয়েছে। এতে বড় বড় শিল্প মালিকরা সহজেই অর্থ বা চাপ প্রয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে আপোষ করে ফেলতে পারবে। এছাড়া এখনো বেশিরভাগ জেলায় খাদ্য আদালত গঠিত হয়নি। ফলে এখনো আইনটির সুফল মিলছে না।

খাদ্য আইন বাস্তবায়ন করে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও পরিবেশনের মাধ্যমে দেশীয় ও বিদেশি সব প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। এতে যেমন একদিকে খাদ্য সুশাসন নিশ্চিত হবে তেমনি বিদেশে যেসকল প্রতিষ্ঠান খাদ্য রপ্তানি করে তারাও সর্তক হবে। ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি হওয়ার পাশাপাশি বিদেশেও বাংলাদেশের সুনাম অক্ষুণ্ন থাকবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

বাংলাদেশের সংবিধানে সুশাসন, সম-অধিকার, মানবসত্ত্বার মর্যাদা, মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও স্বাধীনতার ৪০ বছর পার হয়ে আজও প্রতিবন্ধীরা বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম-অধিকার ও নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রবর্তন করা হয়। আইনটিতে শুধুমাত্র সুরক্ষার কথাই বলা হয়নি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংজ্ঞা, প্রতিবন্ধীত্বের ধরন ও

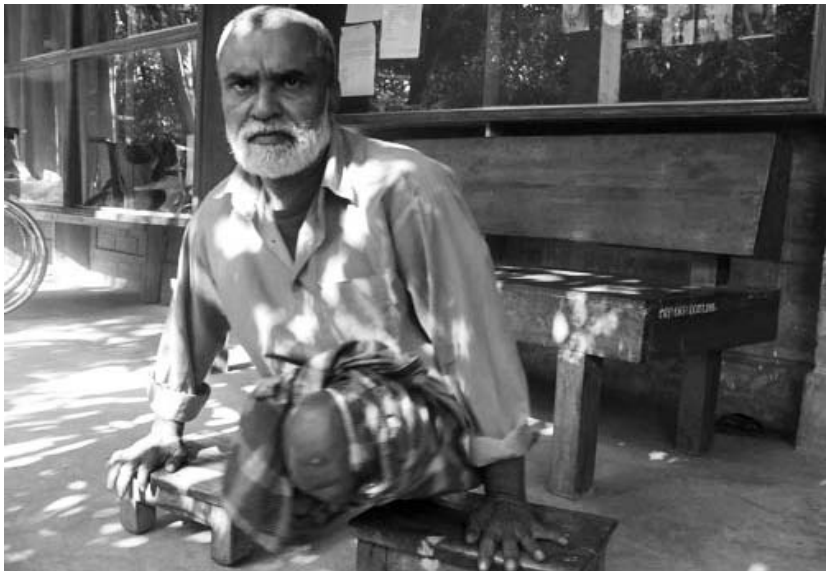

বিভিন্ন অবস্থার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কী কী অধিকার ও সুবিধা ভোগ করবে তাও ১৬(১) ধারায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে এবং তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া একটি জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি ও উপজেলা কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এই আইন অনুসারে গণপরিবহনে ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোনো বৈষম্য হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করলে অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করলে বা পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম, প্রকাশনা ও অন্য মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা প্রদান বা নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করলে অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এছাড়াও মিথ্যা পরিচয়ে বা অসত্য তথ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে পরিচয়পত্র নিলে অনধিক ১ বছর জেল বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। তবে পরিচয়পত্র জাল তৈরি করলে সাত বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সুরক্ষার জন্য দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করলেও সব অপরাধ জামিনযোগ্য ও অ-আমলযোগ্য করায় কিছুটা সহজ আইনে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া আইনটি সব ধারা আপোষযোগ্য করায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজেই প্রভাবশালীরা অর্থ বা চাপ প্রয়োগ করে আপোষ করে ফেলতে পারবে। ফলে আইনটির কাঙ্ক্ষিত ও আশাপ্রদ সুফল নাও মিলতে পারে।

শেষ কথা

আইন প্রণীত হয় মানুষের কল্যাণের জন্য, কিন্তু কোনো আইন যদি জনস্বার্থবিরোধী হয়, তা এক পর্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এজন্য আইন প্রণেতাদের উচিত, মানবাধিকার ও জনস্বার্থের বিষয়টি সমভাবে বিবেচনায় নিয়ে আইন প্রণয়ন করা, যেন কোনো গোষ্ঠী সেই আইনের অপপ্রয়োগ করতে না পারে। একইসাথে জনকল্যাণকর যেসব আইন বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

এ্যাডভোকেট শামিম আল মামুন:
মানবাধিকার কর্মী।
sam_cu_law@yahoo.com

নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতন

নূর-এ-জান্নাতুল ফেরদৌস রুহী

জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এ দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সহিংসতার শিকারে পরিণত হওয়া যেন এক নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৪ সালে জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দিনাজপুর, যশোর, সাতক্ষীরা ও ঠাকুরগাঁওয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ, ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা বা না করার সামান্য অজুহাতেই সংখ্যালঘু মানুষ চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। এ যেন স্বাধীন দেশের নাগরিকের স্বাধীনতার ওপরই রাজনৈতিক ক্ষমতার এক নিষ্ঠুর তামাশা! আর এর কারণ একটাই, শুধু 'সংখ্যালঘু' হওয়াই তাদের যেন সবচেয়ে বড় অপরাধ! অথচ এ ধরনের নির্যাতনের বিপরীতে তাদের সুরক্ষার জন্য কোনো ধরনের উদ্যোগই চোখে পড়ছে না।

নির্বাচন ও সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক, কমছে হিন্দু সম্প্রদায়

নির্বাচন এলেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। এখানে একটা ধারণা আছে, হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভোট মানেই একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীর ভোট। আর এ ধারণার উপর ভিত্তি করেই হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার জনগোষ্ঠী নির্বাচনের সময় অহেতুক হুমকি-ধামকির সম্মুখীন হন। তাদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করা হয়। ভোটে হেরে গেলে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। নির্বাচনের পরবর্তীতে এই ঘটনা এখন আমাদের দেশের একটা অন্যতম সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতার পরপরও ১৯৭৪ সালে মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ১৩.৫ ভাগ ছিল হিন্দু, ১৯৮১ সালে সেটা কমে ১২.১ ভাগে নেমেছে, ১৯৯১ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে ১০.৫ ভাগে, ২০০১ সালে সেটা কমে এসেছে ৯.২ ভাগে এবং ২০১১ সালের গণশুমারিতে এ সংখ্যাটা ৮.৫ শতাংশে এসে পৌঁছেছে। দেখা যাচ্ছে, প্রতি দশ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় দেড় থেকে দুই শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে প্রায় ৩ শতাংশ (প্রায় ৪২ লাখের কাছাকাছি) হিন্দু জনগোষ্ঠী এ দেশ থেকে চলে যায়। এর প্রধান কারণ বাবরি মসজিদ ইস্যুতে সরকার হিন্দুদের বাড়িঘর ও মন্দির ভাঙায় উৎসাহ দিয়েছে এবং ২০০১ সালের নির্বাচনের পর হিন্দুদের ওপর আগৈলঝাড়া, রামশীলসহ সমগ্র বাংলাদেশে তাণ্ডব চালানো হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচিত কোনো সরকারের কাছেই সংখ্যালঘু ও দুর্বল জনগোষ্ঠী নিরাপদ নয়। এ হচ্ছে স্বাধীন দেশের গণতন্ত্র!

আজও বিচার হয়নি ২০০১ সালের সংখ্যালঘু-নির্যাতনের

প্রতি নির্বাচনেই দুই প্রধান দলের নির্বাচনী ইশতেহারেই থাকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসানের প্রত্যয়। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর এগুলো আর কিছুই মনে থাকে না। তাই বিচারের মুখোমুখিও হয় না অত্যাচারীরা। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘুরা দেশব্যাপী যেভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তা মধ্যযুগের বর্বরতাকেও হার মানায়। উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এই ঘটনা তদন্তে একটি কমিশন গঠন করে। দোষীদের বিচারের আওতায় আনার সুপারিশ করেন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। কিন্তু তদন্ত কমিশনের এ

সুপারিশ সত্ত্বেও ২০০১ সালের নির্বাচনপরবর্তী সহিংসতায় এখন পর্যন্ত এক আসামিরও বিচার হয়নি। সংখ্যালঘুদের নির্যাতন-নিপীড়ন করার পরও অপরাধীদের দণ্ডিত হতে হয় না বলে নিপীড়করা এ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করে।

সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে করণীয়

ভারতে সংখ্যালঘুদের জন্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণবিষয়ক মন্ত্রণালয় রয়েছে। একাধিকবার রাষ্ট্রপতি-উপরাষ্ট্রপতিসহ সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদেও সংখ্যালঘুরা আসীন হয়েছেন। এমনকি মূলধারার রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হয়েছেন এমন নেতার সংখ্যাও সেদেশে কোনো অংশে কম নয়। ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও তফশিলি সম্প্রদায়ের লোকজন প্রশাসন এবং সামরিক বিভাগেও উচ্চপদে আসীন হয়েছেন। শুধু ভারতেই নয়, পাকিস্তানের মতো একটি অস্থিতিশীল দেশেও প্রধান বিচারপতি পদে সংখ্যালঘুরা যেতে পারেন এবং সে দেশের জাতীয় পরিষদের সংরক্ষিত ৭০টি আসনের মধ্যে ১০টি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ করা আছে। কিন্তু আমাদের মতো প্রগতিশীল ধারার রাজনীতিতে এখনও এমনধারার উদাহরণ তৈরি হয়নি। রাজনীতির এই অপসংস্কৃতি থেকে বেড়িয়ে এসে ভারত ও পাকিস্তানের এসব উদারীকরণ নীতিমালা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরাও এই বৈষম্য দূর করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতিতে সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহারের নীতি থেকে সরে এসে তাদের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। একই সাথে দলগুলো বাংলাদেশের সংবিধানের ৪১ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দেশ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে- এমনটিই প্রত্যাশা।

নূর-এ-জান্নাতুল ফেরদৌস রুহী: লেখক ও সাংবাদিক।
jannatulruhi@gmail.com

ওয়ারি রবিদাস পাড়া : এটা কি মানুষের জীবনযাপন? - সজীব রবিদাস

সুদীর্ঘ সত্তর বছর থেকে ঢাকার ওয়ারির উত্তর ও দক্ষিণ রবিদাস পাড়ায় প্রায় তিন হাজার দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ বিভিন্নভাবে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে বসবাস করে আসছে। এখানে না আছে গ্যাসের কোনো ব্যবস্থা, না আছে পানি ও টয়লেটের ভাল সুবিধা। বাসস্থানের সমস্যা তো আছেই, ছোট একটা ঘরে দুই/তিন প্রজন্ম বসবাস করে এবং সেই ছোট ঘরটায় লাকড়ি দিয়ে রান্না করে। এ সময় ঘরটিতে ধোঁয়া দিয়ে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর পরেও অনেক টাকা দিয়ে লাকড়ি কিনে তাদেরকে রান্নার কাজ সারতে হয়। এতে করে তাদের রান্না খাতেই প্রতিমাসে অধিক টাকা গুনতে হয়।

তাদের পুরানো পেশা হলো জুতা মেরামত অথবা নতুন জুতা তৈরি করা কিন্তু বর্তমানে অদলিত কিছু ব্যবসায়ী এই ব্যবসাটাকে স্বল্প মূল্য করার কারণে ব্যবসায় তাদের উন্নতি নাই বললেই চলে। দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ হওয়ার কারণে আশেপাশের ভাল স্কুলে তাদের সন্তানরা ভর্তি হতে পারে না। সবচেয়ে যে জিনিসটি আমাকে বেশি কষ্ট দেয় সেটা হলো আমি যখন ওই পাড়ায় চাঁন মোহন রবিদাস এর বাসায় লজিং থাকতাম, আমার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যখন আমি তাদের বাড়িতে থাকতাম তখন আমাকে সকাল বেলা টয়লেট করার জন্য অনেকগুলো ঘর পার হয়ে আসতে হতো এবং দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। কারণ তিন হাজার মানুষের জন্য মাত্র ১২টি টয়লেট তার মধ্যে ৬টি পুরুষের এবং ৬টি নারীদের ব্যবহারের জন্য। এ টয়লেটে পানির কোনো সুব্যবস্থা নাই। আর অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে টয়লেটের পরিবেশের কথা বলার মতো নয়।

পরিশেষে সেই আগের কথায় ফিরে আসি, এই এলাকার মানুষের আকুল আবেদন যে অনেক সময় আমাদের লাকরি কেনার টাকা থাকে না এবং থাকলেও অনেক সময় পাওয়া যায় না, তাই রান্নাও হয় না। আমাদের গ্যাসের ব্যবস্থা থাকলে ছোট ঘরটায় একটু শান্তি আসতো এবং দু'বেলা খাবার রান্নার সুব্যবস্থা হতো। আমাদের ছেলে মেয়েরা তাদের পড়াশুনা একটু ভালো মতো করতে পারতো। এই মানুষদের মধ্যে নেতৃত্ব তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে। তাদের সন্তানদের ভালো স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে এবং বঞ্চনা ও বৈষম্য কমিয়ে আনতে সমাজের সুধী মহল ও এনজিও এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

- সজীব রবিদাস
দলিত মানবাধিকার কর্মী।

লেখা আহ্বান

মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। পাশাপাশি পত্রিকা সম্পর্কে যেকোনো গঠনমূলক সমালোচনাও আমাদের প্রয়াসকে সমৃদ্ধ করবে। নাগরিক উদ্যোগ ত্রৈমাসিক নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশেও আগ্রহী। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, নাগরিক উদ্যোগ ত্রৈমাসিক, ৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। ই-মেইল : nuddyog@gmail.com।

শিশুশ্রম কি কখনো বন্ধ হবে না?

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

শিশুশ্রম এদেশে আজ একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে এবং এ সমস্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলে 'আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ'-এ ধরনের নীতিকথাগুলো বাস্তবিক অর্থে অপপ্রলাপে পরিণত হবে। ফলে শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা এখন জরুরি একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে কল-কারখানা, দোকান-পাট, হোটেল-মোটেল, বিপণীবিতান, বাসাবাড়ি, যানবাহনসহ বিভিন্ন জায়গায় অহরহই দেখা যায় শিশুশ্রমের স্বরূপ। এসব জায়গায় নিয়োজিত শিশুরা সারা মাস হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করে। আর সামান্য অপরাধ করলেই তাদের ভাগ্যে জোটে মালিকের মারধর। কিন্তু এসব 'মালিক' মাস শেষে তাদেরকে মজুরি বাবদ দেয় যৎসামান্য টাকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যতার কারণে আর দশটি শিশুর মতো এদের বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়া কিংবা লেখাপড়া করা সম্ভব হয় না। দারিদ্র্যতাই তাদেরকে বাধ্য করেছে শিশুশ্রমিকের খাতায় নাম লেখাতে।

সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের দোকান-পাট আর চায়ের দোকানে শিশুরা শিশুশ্রমিক হিসেবে কাজ করে এবং শেষ পর্যন্ত তারা নিরক্ষর থেকে যায়। এ যেন ঠিক বাতির নিচে অন্ধকারের অবস্থাকেই তুলে ধরে। দেশের অসংখ্য শিশুর জীবন এভাবে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জীবন-জীবিকার তাগিদে স্কুল ছেড়ে তাদের বাধ্য হয়ে বেছে নিতে হচ্ছে শিশুশ্রমের মতো কঠিন কাজকে। আর এভাবেই দেশের লাখ লাখ শিশু বঞ্চিত হচ্ছে তাদের মৌলিক অধিকারগুলো থেকে। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) ও ইউনিসেফ কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, এদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ শিশুই আর্থিক অনটনের কারণে নাম লেখায় শিশুশ্রমিকের খাতায়।

'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার এ্যাকটিভিটিজ ইন এশিয়া' নামক একটি প্রকাশনাতেও দেখা যায়, অর্থনৈতিক দারিদ্র্যই শিশুশ্রমের সবচেয়ে বড় কারণ। নিতান্তই আর্থিক কারণে বা পেটের দায়ে শিশুরা কাজ করতে বাধ্য হয়। তবে সব সময়ই যে, শিশুরা আর্থিক অনটন বা পেটের দায়ে কাজ করতে বাধ্য হয় তা অবশ্য নয়। আশেপাশের বাড়ির অনেক শিশুর কাজ করা ও তাদের অর্থ উপার্জন করা দেখেও অনেক শিশু কাজ করতে আসে এবং এক্ষেত্রে ওইসব শিশুর বাবা-মা তাদের সন্তানকে কাজ করতে পাঠাতেও খুব একটা কুণ্ঠা বোধ করেন না। কারণ, ওইসব বাবা-মা এ ধরনের ধারণা পোষণ করে যে, স্কুলে গিয়ে লেখা-পড়া শিখে টাকা পাওয়া যাবে না, বরং কাজ করলেই টাকা পাওয়া যাবে। আর এই টাকা দিয়ে প্রয়োজন মিটবে। কিন্তু তারা লেখাপড়ার প্রকৃত অর্থ, গুরুত্ব, মর্মার্থ ও সুদূরপ্রসারী সুফল সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝেন না এবং বোঝার চেষ্টাও খুব একটা করেন না। আমাদের দেশের সংবিধানের ১৫ (ক) ধারায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের জন্য মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে সংবিধানের ১৭ (ক) ধারায় রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

'আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, জাতির কর্ণধার, ভবিষ্যতে আজকের শিশুরাই দেশ-জাতির নেতৃত্ব দিবে'- এমন সব কথাবার্তা বিভিন্ন সভা, সেমিনারসহ বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়ে থাকলেও বাংলাদেশে শিশুদের সামগ্রিক চিত্র কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ। এদেশে শিশুশ্রমিকের সঠিক সংখ্যা কত তার সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী এদেশে প্রায় এক কোটিরও অধিক শিশুশ্রমিক কর্মরত। এরা প্রতিনিয়ত শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে এবং জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য শিশুশ্রমের মতো কঠিন শ্রমকে বেছে নিতে বাধ্য হয়।

এ দেশে ৬-১০ বছরের ১ কোটি ৬২ লাখ শিশুর মধ্যে স্কুলে যায় মাত্র ৫০ ভাগের মতো। এদের মধ্যে আবার শতকরা ৩৫ ভাগ শিশুই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করে দারিদ্র্যতাসহ বিভিন্ন কারণে স্কুল ছেড়ে দেয়। আবার দেশের অনেক শিশু দারিদ্র্যতাসহ বিভিন্ন কারণে কখনোই স্কুলে যায় না। তাছাড়া দেশে ছিন্নমূল শিশুর সংখ্যা প্রায় কয়েক লাখের মতো। এদের শতকরা ৫০ ভাগেরই নিজস্ব কোনো ঠিকানা নেই। এদের সংখ্যা বেশি দেখা যায় রাজধানী ঢাকা শহর তথা দেশের অন্যান্য বড় বড় শহরে। আবার দেশে পুষ্টিহীনতায় ভোগা শিশুর সংখ্যাও কম নয়। দারিদ্র্যতাসহ পিতা-মাতার অসচেতনতার কারণে অনেক শিশুই শিকার হচ্ছে অপুষ্টির। এসব অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর অনেককেই শেষ পর্যন্ত শিশুশ্রমে আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায়। আর বর্তমান সময়ে শিশুদেরকে নানাভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন- মাদক চোরাচালান, চুরি, ছিনতাই-এর কাজে নিয়োজিত করাসহ রাজনৈতিক মাঠে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে এক পক্ষ কর্তৃক আরেক পক্ষের ওপর অস্ত্র ছুঁড়তে, বোমা-গ্রেনেড-পেট্রোল মারতে, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করতে- যা সবচেয়ে মারাত্মক এবং সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয়। দেশের সংবিধানসহ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে শিশুদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে বলা হলেও বাস্তবতা হচ্ছে দেশের অসংখ্য শিশু তাদের বিভিন্ন অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হচ্ছে। এ জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, সরকার, জনগণ, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ সচেতন প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত অধিকার বঞ্চিত শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নে তাদের পাশে দাঁড়ানো- যেন শিশুশ্রম বন্ধ হয়।

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু: বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)।
kekbabu@yahoo.com

দলিত জনগোষ্ঠী : আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ

দলিত ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত অবস্থা ও তাদের অধিকার সম্পর্কে মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ ধানমন্ডির বেঙ্গল ক্যাফেতে সংসদ সদস্যদের সাথে একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছয় জন সংসদ সদস্য, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং মানবাধিকার কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ওই মত বিনিময় সভায় উপস্থাপিত নিবন্ধটি নাগরিক উদ্যোগ ত্রৈমাসিক-এর পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হলো।

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী প্রায় ২৬ কোটি মানুষ জন্ম ও পেশার ভিত্তিতে জীবনের সর্বস্তরে বৈষম্যের শিকার এবং তা অস্পৃশ্যতার ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। এই মানুষগুলোর বেশিরভাগই অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করেন এবং তথাকথিত নিচু পেশা যেমন- সুইপার, ডোম, মুচি বা এ ধরনের কাজে নিয়োজিত হতে বাধ্য হন। জন্ম ও পেশার ভিত্তিতে এই বৈষম্য ও তাদের প্রতি বিদ্যমান অস্পৃশ্যতা চর্চা মানবাধিকার ধারণার পরিপন্থি এবং এটি একটি সামাজিক সমস্যা; যা দারিদ্র তীব্র করে, সামাজিক অস্থিরতা বাড়ায়; যা শেষ পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাধা হিসেবে কাজ করছে। একুশ শতকে সভ্যতার এই স্তরে এসে মানবাধিকার ধারণার পাশাপাশি অস্পৃশ্যতা ও সামাজিক বৈষম্য ধারণাটি মানানসই নয়। এই বৈষম্যের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভারত ও নেপালে একটি বিরাট জনগোষ্ঠী সামাজিকভাবে নিগৃহীত এবং উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত। একই রকম সামাজিক বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ও রাষ্ট্রের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৬৫ লাখ দলিত মানুষ সামাজিকভাবে নিগৃহীত জীবন-যাপন করছেন; যারা নিজেদের দলিত বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। দক্ষিণ এশিয়ায় 'দলিত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও অবহেলার শিকার, আর্থিকভাবে দুর্বল ও ভঙ্গুর কিংবা নির্যাতিত এবং মানুষ তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্পৃশ্য, জাতিচ্যুত কিংবা অপবিত্র হিসেবে বিবেচনা করে।

বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠী

সরকারের দিক থেকে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও এই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন উৎস এবং সংবাদ মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় প্রায় ৬৫ লাখ মানুষ সুইপার, ডোম, কানপুরী, তেলেগু, ঋষি, কাওরা, বেঁদে, রবিদাস, পৌন্ড্র, চা-শ্রমিক, নিকারী, শিকারীসহ প্রায় শতাধিক জাতিগোষ্ঠী পরিচয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে বাস করছে। এরা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার এবং সামাজিকভাবে স্বীকৃত তথাকথিত কিছু নিচু পেশা গ্রহণে বাধ্য হয়। বহুমাত্রিক বৈষম্যের কারণে তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম দলিত হওয়ার দুষ্টচক্রে আটকে পড়ে আছে। এই চক্রাকার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দলিত জনগোষ্ঠী সুইপার, চা-শ্রমিক, মুচি, ধোপা, ডোম, মেথর ইত্যাদি

পেশায় সেবাশ্রমিক হিসেবে কাজ করছে, বিনিময়ে তারা পেয়েছে দারিদ্র্য ও অচ্ছ্যুৎ পরিচয়। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও এ জনগোষ্ঠীর প্রতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবজ্ঞা আর বঞ্চনা যেন 'স্বাভাবিক' ও 'স্বতঃস্ফূর্ত' ব্যাপার। কাঠামোগত সামাজিক ব্যবস্থা ও আচরণের ভেতর দিয়ে 'মূলধারার সমাজে' তারা ক্রমশ 'অপর' হয়ে পড়ে।

দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র

বাসস্থান

দলিত জনগোষ্ঠীর বাসস্থানের যে দুর্দশা, তা বর্ণনা দিয়ে প্রকাশ করা কঠিন। শহরাঞ্চলে দলিতরা সাধারণত সিটি কলোনি, পৌর কলোনিতে এবং গ্রামাঞ্চলে পুকুর পাড়, রাস্তার ধারে এবং খাস জায়গায় খড় এবং কাদা দিয়ে ঘর বানিয়ে নিজেরা একত্রে বসবাস করে। শহরে এগুলো সুইপার কলোনি, ডোমপাড়া, মেথরপট্টি এবং গ্রামাঞ্চলে মুচিপাড়া, ঋষিপাড়া ইত্যাদি নামে পরিচিত। এইসব ঘরে তারা গরমকালে রোদে পুড়ে আর বর্ষাকালে পানিতে ভিজে। আর শহরাঞ্চলে সিটি কলোনিগুলোতে দলিতরা ৮/১০ ফুট মাপের একটি ঘরে অন্তত ৩টি প্রজন্ম বাস করে; যা পুরো মানব সভ্যতার জন্য লজ্জাজনক। একটি ঘরে তিন প্রজন্ম বাস করা যেমন অস্বাস্থ্যকর, তেমনি মানহানিকর ওই ঘরের সবার জন্য এবং সমাজের জন্য। এতে করে দলিত শিশুদের আত্মসম্মানবোধ ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। আরো দুঃখজনক-তারা যদি কোথাও বাসা ভাড়া করতে যায়, পরিচয় পেলে তাদের বাসা ভাড়াও দেওয়া হয় না। আর তারা যেহেতু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভূমিহীন অবস্থায় আছে, ফলে তাদের পক্ষে বাসস্থানের এই চেহারা পাল্টানো কোনোভাবেই সম্ভব হয় না। আর উচ্ছেদ আতঙ্ক তো তাদের নিত্যসঙ্গী। এই জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা বাড়লেও তাদের কলোনির আয়তন বাড়ছে না। ফলে বসবাসের স্থানগুলোতে লোকসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ছে।

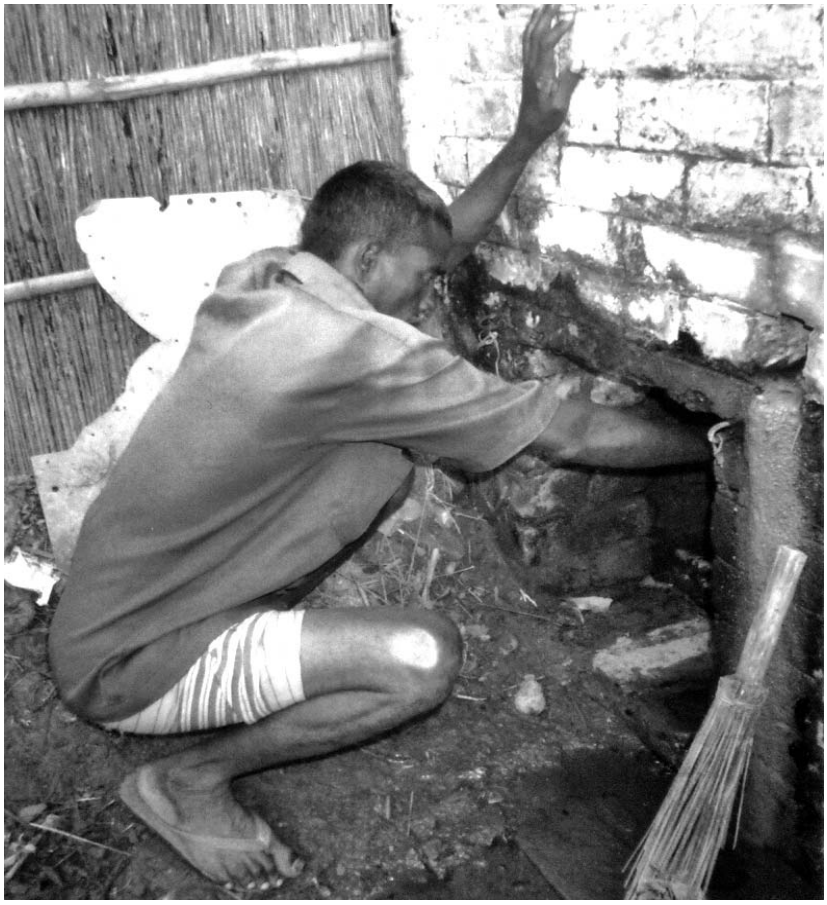

পেশা ও কর্মসংস্থান

বেকারত্ব দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য অন্য অনেক সমস্যার মধ্যে অন্যতম। যেহেতু তারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে এবং অস্পৃশ্যতার কারণে সমাজের অন্যত্র প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে না, সে কারণে তারা অবস্থা পরিবর্তনের জন্য নতুন কোনো পেশা বেছে নিতেও পারে না। ফলে তারা পুনরায় তাদের পৈত্রিক পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়। তাও লোকসংখ্যার তুলনায় তা অপ্রতুল। যারা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কাজ করে তাদের বেতন এতই কম যে, তা দিয়ে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রায় ৬০ শতাংশ পরিচ্ছন্নতা কর্মী প্রতি মাসে মাত্র ৩০০০ থেকে ৫০০০ টাকা উপার্জন করে।

পানি ও পয়ঃনিষ্কাষণ

শহরাঞ্চলে দলিত কলোনিগুলোতে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নেই। একই কারণে যে জনগোষ্ঠী শহরে রাস্তাঘাট পরিস্কার ও অন্যদের টয়লেট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, তাদের কলোনিগুলো থাকে সবচে' নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। এছাড়া যারা বিভিন্ন সময় উচ্ছেদের কারণে কোনো রকমে রাস্তাঘাট বা বস্তিসহ যেসব জায়গায় বসবাস করে, সেসব জায়গাতে পানি সরবরাহ করা হয় না। নগরাঞ্চলের বাইরে চা-বাগানসহ গ্রামীণ দলিত পল্লীগুলোর অবস্থা এর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। মফস্বলে অস্পৃশ্যতার ধারণা প্রবল হওয়ার কারণে পানির উৎসগুলোতে এই জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকারও সহজ নয়। ফলে তারা পানি সংকটে বেশি করে ভোগে। এই পানির অভাবে তাদের পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থা আরো ভঙ্গুর; যা স্বাস্থ্যের জন্য উল্লেখযোগ্যমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ।

স্বাস্থ্যক্ষেত্র

দলিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি তাদের বাসস্থান ও পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দলিত জনগোষ্ঠী প্রতিবেশগতভাবে নোংরা পরিবেশে বাস

করতে বাধ্য হয় এবং চরম দারিদ্র্য যেহেতু তাদের নিত্যসঙ্গী, ফলে তারা নানারকম রোগ-শোক; যেমন- ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পেটের পীড়া ও ত্বকের অসুখে ভুগতে থাকে। তারা যেহেতু দরিদ্র, ফলে চিকিৎসাসেবা তারা ক্রয় করতে পারে না। অন্যদিকে, তারা যখন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যায়, অস্পৃশ্যতার কারণে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও তারা বৈষম্যের শিকার হয়।

শিক্ষাক্ষেত্র

সাধারণভাবে দলিত জনগোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চশিক্ষিত মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীর এক গবেষণা থেকে জানা যায়, শুধুমাত্র লিখতে পড়তে পারা বিবেচনায় দলিতদের মধ্যে শিক্ষিতের হার মাত্র ৫ শতাংশ। সাধারণভাবে স্কুলে শিশুদের ভর্তির হার যেখানে প্রায় ৯০ শতাংশ সেখানে দলিত শিশুদের মধ্যে স্কুলে ভর্তির হার ১০ শতাংশ; যার মধ্যে ঝরে পড়ার হার ৯৫ শতাংশ। এর পাশাপাশি দলিত শিশুদের যারা স্কুলে ভর্তি হয়, তারা কখনো শিক্ষক, কখনো আবার সহপাঠীদের দ্বারা এমন সব আচরণ ও বৈষম্যের শিকার হয়; যা তাদের স্কুলে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। এ প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও যারা পড়ালেখা শেষ করে তারাও শুধুমাত্র জন্মগত পরিচয়ের কারণে উপযুক্ত কর্মসংস্থান পায় না। এটি অন্য শিশুদের স্কুলে যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করে।

নারী স্বাধীনতা

এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচে' বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার দলিত নারীরা। তারা দু'ভাবে বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার। প্রথমত দলিত হিসেবে বৃহৎ সমাজে, দ্বিতীয়ত নিজ সমাজে নারী হিসেবে। বাল্যবিবাহ এই জনগোষ্ঠীর জন্য এক সাধারণ সত্য। এছাড়া রয়েছে নারী হিসেবে তার সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা। পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল। এই জনগোষ্ঠীর নিজ সমাজের রীতিনীতির কারণে তারা সমাজের বাইরে বের হতে পারে না। এর কিছু ব্যতিক্রম আমরা দেখি শহরাঞ্চলে। যদিও তা কেবল পেশাগত কারণে। পড়ালেখা বা অন্য কোনো কারণে বাইরে বের হওয়া তাদের পক্ষে কঠিন। কোনো কারণে দলিত নারীরা স্বামী থেকে পরিত্যক্ত হলে বা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সমাজে টিকে থাকা দলিত নারীদের জন্য আরো কঠিন হয়ে পড়ে।

আইনগত পরিস্থিতি

সামাজিক বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী কোনো আইন না থাকার কারণে জন্ম ও পেশাভিত্তিক বৈষম্যের শিকার এই দলিত জনগোষ্ঠী অস্পৃশ্যতার শিকার হলে আদালতে যেতে পারে না। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের সংবিধানে চেতনাগতভাবে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কারো প্রতি বৈষম্য করা যাবে না বলে আলোকপাত করা হলেও প্রায়োগিকভাবে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকার কারণে সমাজে এই জনগোষ্ঠী উপরোক্ত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পায় না।

দলিত জনগোষ্ঠির সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগসমূহ

সরকারের উদ্যোগ

২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে দলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করার পর বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন:-

১. গত ২৯ মে, ২০১২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্দেশনামূলক যে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে, সেখানে **ক** অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "...শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং শিক্ষিত হরিজন ও দলিত জনগোষ্ঠীর চাকুরির ক্ষেত্রে যথাযথ কোটা রাখতে হবে।" **খ** অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত সেফটি-নেট কর্মসূচি (বিশেষ করে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ভিজিএফ, ভিজিডি কার্ড)-সহ অন্যান্য মানব-সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচিতে হরিজন ও দলিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"

ওই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় হয়ে মন্তব্য করেছেন, ***"হরিজন সম্প্রদায়কে ফেয়ার প্রাইস কার্ড দেওয়া যায়। এছাড়া, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক হরিজন ও দলিত শ্রেণীর জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তারা খুবই মানবেতর জীবন যাপন করে থাকেন।"***

২. চলতি অর্থ-বছরের বাজেটে দলিত, বেদে ও হিজড়াদের জন্য ১২ কোটি ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৪ কোটি ৬১ লাখ এবং ২০১১-১২ অর্থ-বছরেও সরকার দলিতদের আবাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলো।

৩. সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এক বছর মেয়াদে বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবন উন্নয়নে ১০ কোটি টাকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। *সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ নভেম্বর-২০১৩।*

৪. গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৩ জেনেভায় জাতিসংঘের ইউপিআর মেকানিজমের আওতায় বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা উপলক্ষে সরকার যে রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন পেশ করেছিল, সেখানে দলিতদের ভঙ্গুর মানবাধিকার পরিস্থিতি স্বীকৃত হয়েছে এবং মানবাধিকার পর্যালোচনা অধিবেশনে স্লোভানিয়া ও হোলি সি দলিতদের উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি সুপারিশ করেছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি আইন কমিশন ইতোমধ্যে দলিতসহ

সামাজিকভাবে বঞ্চিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান অস্পৃশ্যতা ও বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ***সামাজিক বৈষম্যবিলোপ আইন***-এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে এবং এজন্য সরকারকে সুপারিশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহও দলিত জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বর্তমান সংসদের প্রধান বিরোধী দল-বিএনপি নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০০৮) তাদের ইশতেহারে দলিত ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তথা তফসীলি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিল; যা নিম্নরূপ-

'...সংখ্যালঘু, আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠী এবং ***দলিতদের প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে।*** ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকুরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।' *-নির্বাচনী ইশতেহার, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮* (অনুচ্ছেদ ১৮.১)

- মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণা বাস্তবায়ন করা হবে। পৃষ্ঠা ২৭, অনুচ্ছেদ ২৯/১
- অনগ্রসর তফসীলি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিগত বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত উপবৃত্তি কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করা হবে। পৃষ্ঠা ২৮, অনুচ্ছেদ ৩১/৬- *-নির্বাচনী ইশতেহার, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮*

সামাজিক সংগঠনের গৃহীত উদ্যোগসমূহ

মানবাধিকার সংগঠন নাগরিক উদ্যোগ ও দলিত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংগঠন বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম)-সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সার্বিকভাবে যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- দলিত অধিকার বিষয়ে দেশের সকল জনগণকে সচেতন করা;
- দলিত সম্প্রদায়কে অধিকার সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করা ও সংগঠিত করা;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি নির্ধারণী মহলকে নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- দলিত জনগোষ্ঠীর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার ক্ষেত্রে সহায়তা করা এবং তাদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উদ্বুদ্ধ করা। এজন্য দলিত জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে ২০১১ সালে ***দলিত শিক্ষা ট্রাস্ট*** গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এখন এই সংগঠন থেকে সারাদেশের ৩০ জন দলিত শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

এসবের পাশাপাশি আরো যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা হলো-

- ব্যক্তি ও সংগঠন পর্যায়ে মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা ও সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- দলিত নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সম্পর্ক সৃষ্টি;
- এডভোকেসি, প্রচারাভিযান-এর মাধ্যমে আইন, উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মসূচিকে দলিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে প্রভাবিত করা। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশে কর্মরত উন্নয়ন সহযোগীদের দলিত ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করা;
- গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা; যা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সরকার ও অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা করে;
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ করে জাতিসংঘের সর্বজনীন স্বীকৃত পদ্ধতিতে এডভোকেসি;
- আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সহায়তা

উন্নয়ন সহযোগীদের উদ্যোগ

উপরোক্ত পদক্ষেপ ও উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে ইউরোপিয়ান কমিশন, ইউকে এইড ও ক্রিশ্চিয়ান এইড দলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে সহায়তা করছে।

এই জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে কী করা যেতে পারে-

সামাজিকভাবে মর্যাদাহীন, অনিরাপদ ও নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত হয়ে এই জনগোষ্ঠী এমন এক জীবনের মুখোমুখি; যা সরাসরি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। আমরা মনে করি, এই পরিস্থিতি থেকে এই জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করতে হলে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন-

ক) দলিতদের প্রতি বিদ্যমান সকল বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা চর্চা বন্ধ করা; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল অস্পৃশ্যতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী আইন করা;

খ) দলিতদের মানবাধিকার বিষয়ে জাতীয়ভিত্তিক অনুসন্ধান কার্যক্রম হাতে নেওয়া;

গ) নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে দলিত নারীদের উন্নয়নে বিশেষ সেল গঠন;

ঘ) শিক্ষিত বেকার দলিত তরুণ-তরুণীদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

ঙ) সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় দলিতদের বসবাসের স্থানগুলো আরো সম্প্রসারিত করে তাদের নামে স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া;

চ) দেশের সর্বত্র ভূমিহীন দলিতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে খাসজমি বরাদ্দ দেওয়া এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসন ছাড়া কোনো দলিত পল্লী উচ্ছেদ না করা।

আন্তর্জাতিক নদীর পানিতে অধিকার অববাহিকার সমগ্র মানুষের

অধ্যাপক ড. খালেকুজ্জামান

বিশ্ব রাজনীতির নতুন দ্বান্দ্বিক উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে পানি। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশি দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক নদীর পানি প্রবাহের উপর অংশীদারিত্ব নিয়ে শুরু হয়েছে নীরব রেষারেষি। ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প চালুর ঘোষণা বাংলাদেশকে চরম এক হুমকির মুখে ফেলেছে। এ অঞ্চলের আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানির বণ্টন ব্যবস্থা ও এর প্রভাব নিয়ে নাগরিক উদ্যোগ ত্রৈমাসিক-এর সাথে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের লক হ্যাভেন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক খালেকুজ্জামান পিএইচডি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আলতাফ পারভেজ ও শামসুদ্দোহা শোয়েব।

বাংলাদেশকে আমরা বরাবর জানতাম পানির দেশ- নদীর দেশ- জলাভূমির দেশ হিসেবে। অথচ এখন চারিদিকে শুনছি, দেখছি– পানি এখানে বড় এক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এ সমস্যাটা কতটা তীব্র বলে মনে করেন আপনি?

পানির আলোচনায় দুটি বিষয় আছে। একটা হলো পানির পরিমাণগত দিক এবং অন্যটা হলো পানির গুণগত দিক। পরিমাণগত দিক হলো– আমাদের কত পানি আছে, কত পানি দরকার ইত্যাদি বিষয়। আর গুণগত দিক হলো, যে পানি আমাদের আছে বা আমরা পাচ্ছি– সেটার গুণগত মান কেমন, সেটা কতটা ব্যবহারযোগ্য ইত্যাদি।

এটা ঠিক যে, এক সময় এদেশে ১২ শত নদী ছিল। কিন্তু এখন পানির পরিমাণগত ও গুণগত দুটো দিকেই সংকটে আছি আমরা। পরিমাণগত সংকটের একটা দিক হলো ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর কমে যাচ্ছে। সেটা আর আগের মতো নবায়ন হচ্ছে না। আবার ভূ-উপরিস্থ পানির প্রবাহও কমে যাচ্ছে। কারণ প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক নদী থেকে আমরা এখন আর পানি পাচ্ছি না। আবার ভূ-উপরিস্থ আমাদের যে পানি রয়েছে বা যে পানি পাচ্ছি আমরা সেটাও এখন আর ব্যবহারযোগ্য থাকছে না। যেমন, ঢাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নামছে আবার ভূ-উপরিস্থ যে পানি বুড়িগঙ্গায় আছে সেটাও কোনোভাবেই আর ব্যবহারযোগ্য নেই। সেই পানির গুণগত মান খুবই খারাপ।

ফলে পাশে নদী থাকার পরও ঢাকার জন্য এখন পানি খোঁজা হচ্ছে দূরে– যেখান থেকে হয়তো বয়ে আনা হবে সেই পানি। কিন্তু বিপদ তো বহুদিক থেকে আসছে। প্রায় ৫৯টি জেলার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে ইতোমধ্যে সহনীয় মাত্রার চেয়ে অধিক আর্সেনিক দূষণ ঘটে গেছে। ফলে বিশাল এক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে গেছি আমরা।

আপনি বললেন, নদীগুলোতে আমরা আর পানি পাচ্ছি না এখন। এটা বিরাট এক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু নীতিনির্ধারক কেউ তো এ বিষয়ে কিছু বলছে না। পানি আসছে না কেন? সেগুলো কি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে? কীভাবে?

প্রথম বিষয় হলো, আন্তর্জাতিক নদীগুলোর ভাটিতে আমরা। নিচের দিকে আমাদের বাস। উজানের দিকে যারা থাকে তাদের অবস্থান হলো সুবিধাজনক। সাধারণভাবে এটাই ধরে নেওয়া হয়, আন্তর্জাতিক নদীর পানিতে অববাহিকার সমগ্র মানুষের অধিকার থাকবে; কোনো দেশের অধিকার নেই নদীর তার অংশে এমন কিছু করা – যার ফলে অন্য দেশের অববাহিকার মানুষের পানি প্রাপ্তির অধিকার লঙ্ঘিত হয়। আমাদের দেশের অনেক নদীর উৎপত্তি হয়তো চীনে। সেটা ভারত নেপাল হয়ে হয়তো আমাদের দেশে এসেছে।

এই দীর্ঘ পথের দু'পাশের সকল মানুষের ঐ নদীর পানিতে অধিকার রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের অংশে অববাহিকার মানুষদের পানি পাওয়ার সেই অধিকার এখন লঙ্ঘিত হচ্ছে। কারণ আন্তর্জাতিক নদীগুলোর উজানে শত শত বাঁধ দেওয়া হচ্ছে; কেবল গঙ্গাতেই শত

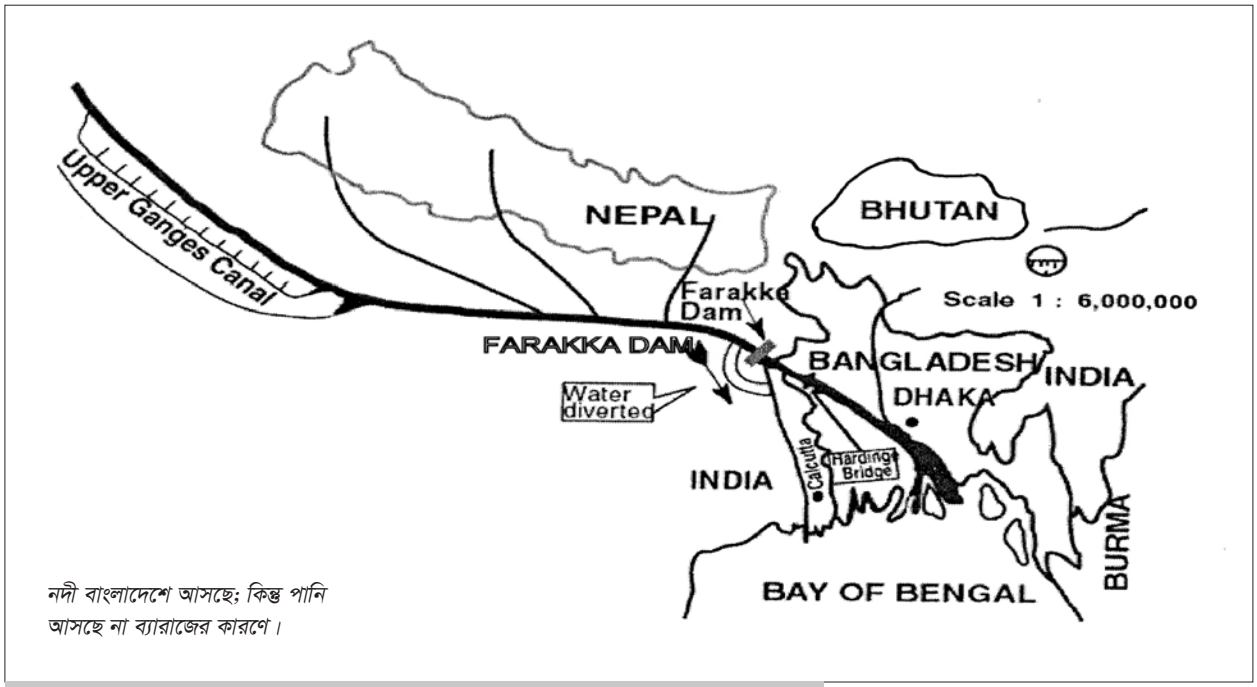

নদী বাংলাদেশে আসছে; কিন্তু পানি আসছে না ব্যারাজের কারণে।

শত বাঁধ আছে উজানে। উপরন্তু সেগুলো থেকে সেচের জন্য জায়গায় জায়গায় পানি প্রত্যাহার হচ্ছে; জলবিদ্যুত কেন্দ্র করে সেখানে পানির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে। আবার এত বাধা পেরিয়েও যে পানি আসছে সেটাও দীর্ঘ পথে শিল্পবর্জ্যে দূষিত হয়ে আসছে। সবাই আমরা বলছি, পানি কম পাওয়া যাচ্ছে– কম পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু যে পানি পাওয়া যাচ্ছে তার গুণগত মান নিয়ে কেউ উদ্বিগ্ন নয়। এটাও কিন্তু একটা বড় উদ্বেগের দিক। এই দূষিত পানি অধিক হারে পেলেও তো আমরা কোনো কাজে লাগাতে পারবো না।

আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানির গুণগত দিক সুরক্ষার বিষয় বলছেন আপনি। কিন্তু আমাদের এলাকায় আমরা দেখছি– অনেক নদীতে বছরের বিরাট একটা সময় কোন পানিই থাকছে না–

এর কারণ হলো, ভারত সেখানে একতরফাভাবে পানি নিয়ন্ত্রণ করছে। এসব নদীর পানির ব্যবস্থাপনা একদম আমাদের হাতে নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চুক্তি করেও আমরা নির্ধারিত পানি পাচ্ছি না। এটা সত্য যে, ভারতেও মানুষ বাড়ছে– ফলে সেখানেও পানির প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। কিন্তু তার মানে তো এই হতে পারে না যে, অববাহিকার অন্য অঞ্চলের মানুষের পানির প্রয়োজনীয়তাকে সে একেবারে অগ্রাহ্য করবে। কিন্তু কার্যত তাই হচ্ছে। বাংলাদেশ অঞ্চলের মানুষের পানির প্রয়োজনকে ভারত সামান্যই বিবেচনা করছে। নদীগুলোর স্থানে তারা বাঁধ দিচ্ছে, সেচের জন্য পানি প্রত্যাহার করছে, জলবিদ্যুত কেন্দ্র করছে– সবই হচ্ছে উজানের দেশ হিসেবে বাংলাদেশে কী ঘটবে সেটা বেমালুম অবজ্ঞা করে। এক্ষেত্রে আমরা কেবল ফারাক্কা বাঁধের কথা জানি। কিন্তু এরকম ছোট ছোট বাঁধ সেখানে শত শত।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেও পানির প্রবাহ কমছে। সেটা মোকাবেলায়ও আন্তর্জাতিক নদীর পানির যৌথ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন ছিল।

বিশ্বের অন্য অঞ্চলে যেসব যৌথ নদী রয়েছে সেখানে কী এরকমভাবে উজানের দেশ নির্বিবাদে পানি সরিয়ে নেয়?

সকল অঞ্চলে উজানের দেশগুলো এমন করে– এটা বলা যাবে না। তবে শক্তিশালী দেশগুলো অনেকেই করে। যেমন, চীন আশেপাশের দেশগুলোর সাথে তার যেসব অভিন্ন নদী রয়েছে সেখানকার পানি নিয়ে শক্তি প্রদর্শন করে। তবে ভারত যা করছে সেটা চরম ধরনের। ভাটির দেশের পানির প্রয়োজনীয়তাকে এতটা অগ্রাহ্য আর কেউ করে না। পানি নিয়ে বিশ্বজুড়েই সংঘাত আছে– তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেই বৈরিতা সবচেয়ে বেশি।

এক্ষেত্রে ছোট দেশগুলোর করণীয় কী?

সচেতন হতে হবে। সংঘবদ্ধ হতে হবে। অন্য দেশগুলোর সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলতে হবে। যেমন, মেকং নদীকে ঘিরে বিভিন্ন দেশের একটা কমিশন গড়ে উঠেছে। যদিও চীন এই কমিশনে আসেনি– কিন্তু সকলে এই কমিশনের মাধ্যমে একটা শক্তিশালী পানি ব্যবস্থাপনার আদর্শ গড়ে তুলতে পারছে– যা চীনের পক্ষে একেবারে অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না।

আমরা নেপালের সঙ্গে, চীনের সঙ্গে, ভূটানের সঙ্গে এসব বিষয়ে যৌথ অবস্থান গড়ে তুলতে পারি– কারণ অববাহিকাভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনাই বর্তমান বিশ্বে আদর্শস্থানীয়।

আপনি সম্প্রতি ঢাকায় যে কারিগরী সেশনগুলোতে বক্তৃতা দিলেন – তাতে দেখা গেছে, চুক্তি করেও আমরা যৌথ নদীতে পানির হিস্যা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

এটা তো নিঃসন্দেহে বিশ্ব পরিসরে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা?

আমি গঙ্গাচুক্তির উদাহরণ দিয়েছিলাম। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে এই চুক্তি করে। অভিন্ন নদীগুলোর মধ্যে এই একটি নিয়েই চুক্তি আছে আমাদের। এই চুক্তির প্রধান দিক হলো জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ফারাক্কা পয়েন্টে কী পরিমাণ পানি পাবে তার একটি ফর্মূলা আছে সেখানে। সমস্যা রয়েছে এই চুক্তির ভিত্তিতে। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এরকম: বলা হয়েছিল ১৯৪৮ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত ফারাক্কা পয়েন্টে গড়ে যে পরিমাণ পানি এসেছে তাকে পানি বণ্টনের ভিত্তি ধরা হবে।

আবার বিকল্প আরেকটি ভিত্তির কথা বলা হয়েছে: প্রত্যাশিত পানি না এলে যা আসছে তার ভিত্তিতেই হিস্যাটা ভাগ হবে। এখন দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় বিকল্পই অনুসরণ হচ্ছে। অর্থাৎ ভারত যে ফারাক্কার আগেই জায়গায় জায়গায় পানি প্রত্যাহার করছে সেটা আর আমাদের তরফ থেকে তোলাই হচ্ছে না। উপরন্তু চুক্তি অনুযায়ীও আমরা নির্ধারিত পানি পাই না। অন্তত ২৫ ভাগ সময়ে আমরা চুক্তি অনুযায়ীও পানি পাইনি। এটা যৌথ নদী কমিশনের তথ্য থেকেই আমরা দেখেছি। কেবল গতবার ফারাক্কার কিছু গেইট ভেঙ্গে বাড়তি কিছু পানি চলে এসেছিল। আপনারা জানেন হয়তো, ফারাক্কায় ১০৯টার মতো গেইট রয়েছে।

গঙ্গার আলোকে তো আমরা তিস্তার পানি নিয়েও চুক্তি করতে চাইছি। কিন্তু সেটাও এগোচ্ছে না। এর পেছনে কী কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন?

প্রথমে মনে রাখতে হবে তিস্তাতেও উজানে অনেক জায়গায় পানি প্রত্যাহার হচ্ছে। দার্জিলিংয়ের আশেপাশে বিশাল সেচ প্রকল্প চালানো হচ্ছে তিস্তার পানি দিয়ে। অনেক জায়গায় জলবিদ্যুত কেন্দ্র করে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

> পুরো তিস্তার অববাহিকায় মানব বসতি কিন্তু বাংলাদেশ অংশেই বেশি। উজানের অংশে মানব বসতি অনেক কম। পানি তো প্রধানত মানুষ ও কৃষির জন্য। অর্থাৎ অববাহিকার প্রয়োজন অনুযায়ী পানির বণ্টন হওয়া উচিত। এই যুক্তিতে বাংলাদেশ তিস্তার পানিতে বাড়তি হিস্যার দাবিদার।

অথচ পুরো তিস্তা অববাহিকার মানুষের জন্য এই পানি। সর্বশেষ ভারত গজলডোবায় ব্যারাজ করেছে। ফলে তিস্তা দিয়ে আমাদের দিকে এখন কম পানিই আসছে। এর মাধ্যমে কেবল বাংলাদেশ নয়– পশ্চিমবাংলারও বিশাল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গজলডোবার পর নদীটি বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত আসতে আরও ১২০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছে। এই দীর্ঘ অববাহিকার মানুষও বাংলাদেশের মতোই এখন তিস্তার পানি থেকে বঞ্চিত। গজলডোবায় ব্যারাজ হওয়ার পর পূর্ব থেকে এখন অন্তত ৮৫ ভাগ পানি কমে গেল।

মমতা বন্দোপাধ্যায় সেজন্যই বলছেন– পানি তো আমাদের কাছেই নেই– বাংলাদেশকে আর কী দেবো? তাদের এখন মত হলো, গজলডোবা পয়েন্টে যে পানি আসবে বাংলাদেশকে তার ২৫ ভাগ দেবে। যদিও কিছু দিন আগে মনমোহনের সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর যে চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তাতে সাধারণভাবে অর্ধেক পানি বাংলাদেশকে দেওয়ার প্রস্তাব ছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু তা তো হয়নি।

তিস্তার পানির আলোচনায় আপনি বাংলাদেশের অবস্থানের কোনো দুর্বলতা দেখছেন কী?

আমার বিবেচনায় বাংলাদেশ আলোচনায় একটা বড় প্রসঙ্গ তুলে ধরতে পারছে না– তা হলো, পুরো নদীটির অববাহিকায় মানব বসতি কিন্তু বাংলাদেশ অংশেই বেশি। উজানের অংশে মানব বসতি অনেক কম। পানি তো প্রধানত মানুষ ও কৃষির জন্য। অর্থাৎ অববাহিকার প্রয়োজন অনুযায়ী পানির বণ্টন হওয়া উচিত। এই যুক্তিতে বাংলাদেশ তিস্তার পানিতে বাড়তি হিস্যার দাবিদার।

ভারত যৌথ নদীগুলো থেকে পানি প্রত্যাহারের জন্য 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প' নামে যে প্রকল্প নিয়ে এগোচ্ছিলো সেটা নিয়েও আমাদের এখানে ব্যাপক উদ্বেগ রয়েছে। যদিও এর বিস্তারিত আমরা জানি না।

এটা ছিল অনেকটা আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তৈরি একটি দৈত্যসুলভ পরিকল্পনা। যার মূল বক্তব্য হলো: ভারতে একদিকে বাড়তি পানি নদী বয়ে চলে যাচ্ছে ভাটিতে– অথচ দেশটির অন্য অংশ শুকনো থাকছে– এটা হতে পারে না। বাড়তি পানিগুলো খাল কেটে শুকনো অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে ভারতে উন্নয়ন সুষম রূপ নেবে। পাশাপাশি তারা এসব পরিকল্পনা থেকে বাড়তি ৩৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েও এগোচ্ছে।

এই প্রকল্পের একটা দিক ছিল হিমালয় অঞ্চলের বড় নদীগুলোর মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে একটার পানি অন্যটায় নেওয়া। বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগের জায়গা এখানেই। কারণ এর মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রত্যাহারের প্রস্তাবও রয়েছে।

ভারতে যারা এই প্রকল্পের চিন্তাভাবনা করেছেন– তারা পুরোপুরি ভুলে থাকতে চেয়েছেন যে, ভাটিতে বাংলাদেশ বলে একটা দেশের ১৬ কোটি মানুষ এসব নদীর অববাহিকায় বাস করে। তাদেরও পানির দরকার। যদিও ভারতের রাজনীতিবিদরা বারবার বলেছেন, যে বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কিছু তারা করবেন না– কিন্তু কার্যত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের কাজ কিন্তু অনেক দূর এগিয়েছে। বিজেপি তো এই পরিকল্পনা নিয়ে খুবই উৎসাহী।

সম্প্রতি তারা কেন-বেতোয়া সংযোগ খাল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। এ রকম ৩০টি সংযোগ খাল করবে তারা। কেন ও বেতুয়া দুটোই গঙ্গার শাখা নদী। এদের সংযোগের মাধ্যমে এক জায়গার পানি অন্য জায়গায় সরানো হলে ফারাক্কা পয়েন্টে আরও পানি কমে যাবে এবং আমরা আরও পানি কম পাবো। যৌথ অববাহিকায় এভাবে একতরফাভাবে ভারত পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করছে যা বাংলাদেশের জন্য চরম বিপর্যয়কর হবে।

উদ্বেগের বিষয় হলো বাংলাদেশে এ নিয়ে কারো কোনো উচ্চবাচ্য নেই। সরকার এ বিষয়ে ভারতের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলছে কি না তাও শোনা যায় না। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প হলে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হবে সেটা তো ভারতে যেয়ে তাদের বোঝাতে হবে।

ভারতের সঙ্গে দরকষাকষিতে আমাদের এখানে সংকোচের শেষ নেই। টিপাইমুখ প্রকল্প সম্পর্কে এমনও অনেকে বলেছেন যে, এই প্রকল্প হলে বাংলাদেশ লাভবান হবে!

এটা কীভাবে সম্ভব! এটা এমন এক প্রকল্প যেখানে আন্তঃনদীতে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করবে ভারত। তারা কখন পানি থামাবে– কখন ছাড়বে তার কিছুই আমরা জানি না। এটা নিয়ে আন্তর্জাতিক কোনো নিরপেক্ষ স্টাডি হয়নি। এ অবস্থায় যারা বলছেন, এই প্রকল্প থেকে বাংলাদেশ লাভবান হবে– তারা অবশ্যই জনমতকে বিভ্রান্ত করছেন। খোদ ভারতের ঐ প্রদেশগুলোতে এই প্রকল্প নিয়ে প্রবল বিরোধিতা রয়েছে। আমি মনে করি, টিপাইমুখ প্রকল্প হলে বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের জীবন-জীবিকায় ব্যাপক বিরূপ প্রভাব পড়বে। টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে ভারতে যে সমীক্ষা হয়েছে তাতে বাংলাদেশের উপর এই প্রকল্পের অভিঘাত নিয়ে কোনো বিবেচনাই ছিল না। আবার আমাদের দেশে যে সমীক্ষা হয়েছে তাতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার কোনো তথ্য সংগৃহীত হয়নি। সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে। উজান ও ভাটি উভয় অঞ্চলের তথ্য ছাড়া কোনো পানি প্রবাহ সম্পর্কে ভারসাম্যমূলক কোনো সমীক্ষা হতে পারে না।

আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে, এই বাঁধ বাংলাদেশের মেঘনা অববাহিকায় পানি প্রবাহের ঐতিহাসিক ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। যদি উজানে বাড়তি বৃষ্টির ফলে বাঁধ দিয়ে আমাদের এদিকে বিশেষত শুকনো মৌসুমে বাড়তি পানি ছেড়ে দেওয়া হয়– তা হলে হাওরে ঐসময় ধান চাষ বিঘ্নিত হবে। কেবল এই একটি ঘটনাই তো মহাবিপর্যয়কর। হাওর তো বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম ভরসা।

একজন পানি বিশেষজ্ঞ হিসেবে পানি নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের এই জটিল অবস্থা সম্পর্কে আপনার একটা মন্তব্য দিয়ে এই আলাপচারিতা শেষ করতে চাই।

আমি শুধু এটুকু বলবো, বাংলাদেশ যদি ভারতের একটা অঞ্চল হতো তা হলে কি ভারত এরকম ভূমিকা নিতে পারতো যা সে করতে চাইছে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, টিপাইমুখ বাঁধ, তিস্তা চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে?

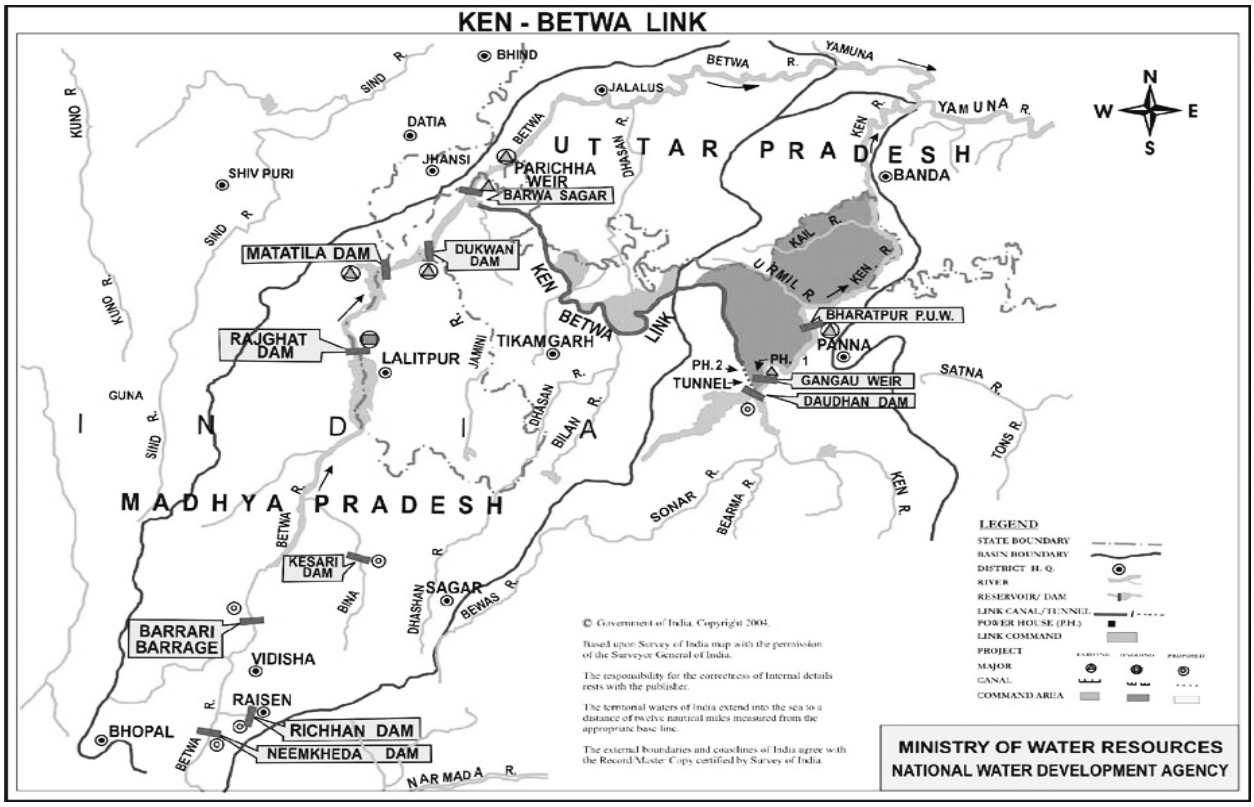

কেন ও বেতোয়া নদীর মাঝে কৃত্রিম খাল তৈরি শুরু

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বাস্তবায়নে নামলো ভারত

আলতাফ পারভেজ

সম্প্রতি বহুল আলোচিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করেছে ভারতে। কেন [Ken] ও বেতোয়া [Betwa] নদীর মাঝে সংযোগকারী কৃত্রিম খাল তৈরির মাধ্যমে এই প্রকল্পের প্রথম ধাপ শুরু করতে দেশটির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে বলে জানিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া।

উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে কেন ও বেতোয়া নদী মাঝে সংযোগের মাধ্যমে কেন বেসিন থেকে 'উদ্বৃত্ত' পানি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক বেতোয়া বেসিনে নেয়ার লক্ষ্যে ঐ দুই প্রদেশের সরকার ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একদফা ত্রিপক্ষীয় মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং [MoU] স্বাক্ষর হলেও দীর্ঘ নয় বছর পর তার বাস্তবায়ন শুরু হলো।

মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ জুড়ে প্রবাহিত কেন ও বেতোয়া উভয়েই যমুনায় মিশেছে। আর যমুনা মিশেছে গঙ্গায়। বেতোয়া স্থানীয়ভাবে ভেত্রাবতী নামেও পরিচিত। কেন নদীর দৈর্ঘ্য হলো ৪২৭ কিলোমিটার এবং বেতোয়া হলো ৫৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ।

পুরোপুরি কংক্রিটে তৈরি কেন-বেতোয়া নদী সংযোগ খালটি হবে প্রস্তাবিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ৩০টি পরিকল্পিত খালের প্রথমটি– যার দৈর্ঘ্য হবে ৩২৩.৪৫ কিলোমিটার। তবে এই নির্মাণ উদ্যোগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো মধ্যপ্রদেশের সাত্তারপুর-পান্না জেলার সীমান্তে প্রকল্পের মধ্যে ৭৩.৮০ মিটার উচু একটি ড্যাম গড়ে তোলা হবে। যার দু' স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের দুটি কেন্দ্র থাকবে। কেন-বেতোয়া সংযোগ খাল থেকে ভারত মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের ৪.৯৭ লাখ হেক্টর জমিকে নতুন করে সেচের আওতায় আনবে বলে পরিকল্পনা করছে। যেসব জেলায় সংযোগ খাল থেকে সেচের পানি যাবে তার মধ্যে রয়েছে– মধ্যপ্রদেশের সাত্তারপুর, টিক্কাগড়, পান্না, রাচি, বিদিশা এবং উত্তর প্রদেশের ঝাসি ও হামিরপুর। সেচ ছাড়াও বিদ্যুত উৎপাদনের পরিকল্পনা থাকায় কেন-বেতোয়া প্রকল্প বিশেষজ্ঞ পরিমণ্ডলে 'সেচ-কাম-বিদ্যুত প্রকল্প' হিসেবেই পরিচিত।

পরিবেশবাদী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো প্রথম থেকে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাদের বড় উদ্বেগের কারণ হলো পান্না জেলায় ভারতের যে 'টাইগার রিজার্ভ পার্ক' রয়েছে সেই বনভূমির বিরাট

এলাকা প্রকল্পের কাজের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। এছাড়া এই প্রকল্পের কৃত্রিম খালের জন্য বহু মানুষকে উচ্ছেদও হতে হবে।

এই প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘসূত্রিতার আরেকটি কারণ ছিল মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের মধ্যে পানি নিয়ে বিবাদ রয়েছে। যে কারণে এ বছরের শুরুতে কেন-বেতোয়া সংযোগ খাল প্রকল্পের প্রতি সবুজ সংকেত দিলেও মধ্য ও উত্তর প্রদেশের মধ্যে সমঝোতার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করে দিয়েছিল। যার সদস্য হলেন চিদাম্বরম, কপিল শিবাল ও পানি সম্পদ মন্ত্রী।

কেন-বেতোয়া প্রকল্প নিয়ে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের বিবাদের অনেকগুলো দিক রয়েছে: প্রথমত, কেন অববাহিকার প্রায় ৮৭ ভাগ পড়েছে মধ্যপ্রদেশে – ফলে এখান থেকে পানি প্রত্যাহারের পরিকল্পনায় তারা উদ্বিগ্ন। দ্বিতীয়ত, যে সংযোগ খালের মাধ্যমে এই পানি বেতোয়া অববাহিকায় নিয়ে যাওয়া হবে তার ৩২৩ কিলোমিটারের মধ্যে মাত্র ১৮ কিলোমিটার পড়েছে উত্তর প্রদেশে। অর্থাৎ খালের জন্য যেসব জমি নষ্ট হবে তার প্রায় পুরোটাই যাবে মধ্যপ্রদেশের। প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ২ হাজার ১৩৫ হেক্টর যাবে মধ্যপ্রদেশ থেকে এবং মাত্র ১৮০ হেক্টর যাবে উত্তর প্রদেশ থেকে। ফলে উচ্ছেদ হওয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে বেশিরভাগকেই পুনর্বাসন করতে হবে মধ্যপ্রদেশে। উল্লেখ্য, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ধারণা নিয়ে ভারত প্রথম কাজ শুরু করে ১৯৮২ সালে। এই ধারণার সমর্থকরা তখন থেকে বলছে, এটা বাস্তবায়ন করা গেলে দেশের ৩৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে; ৩৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুত নতুন করে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা যাবে এবং অনেক প্রদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণও সহজ হবে।

অত্যধিক ব্যয়বহুলতার কারণে প্রথম থেকেই এর বাস্তবায়ন সম্ভাব্যতা নিয়ে অনেক সন্দেহ ছিল। এমনকি গঙ্গার শাখানদী হিসেবে মহানন্দী, গোদাভারী ইত্যাদিতে 'উদ্বৃত্ত' পানি থাকার যে ধারণার উপর ভিত্তি করে এই মেগা প্রকল্পের অভিযাত্রা – তার যথার্থতা সম্পর্কেও এখনো কোনো পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ স্টাডি হয়নি সেখানে। এ বিষয়ে আলোকপাত করে ভারতের সুপরিচিত সাপ্তাহিক 'ফ্রন্টলাইন'-কে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে (৭-২০, এপ্রিল ২০১২) অল ইন্ডিয়া পিপলস্ সায়েন্স নেটওয়ার্কের সভাপতি ডি. রঘুনাথন বলেছেন, 'উদ্বৃত্ত কথাটি তৈরি হয় সাপ্লাই-ডিমান্ডের উপর ভিত্তি করে। গঙ্গা অববাহিকায় পানির বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা সম্পর্কে কোনো নিরপেক্ষ স্টাডি ছাড়াই ধরে নেওয়া হচ্ছে সেখানে বেশি পানি আছে এবং তা সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এই অববাহিকায় যখন আরও অধিক চাহিদা তৈরি হবে তখন এই মেগা প্রকল্প কী কাজে লাগবে? সকল অববাহিকাতেই পানির চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।'

উল্লেখ্য, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মেগা হাইড্রোলজিক্যাল প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে সামাজিক ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া যাচাইয়ের যে রেওয়াজ রয়েছে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে নির্দেশনা দেওয়ার আগে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সে বিষয়ও এড়িয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞদের উপরোক্ত রক্ষণশীল মহামত সত্ত্বেও এই প্রকল্প ধারণাটি বিশেষ বেগবান হয় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে এনডিএ জোট দেশটির কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের পর।

রাজস্থান, গুজরাট, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর মতো হিন্দু প্রধান ও খরা প্রবণ এলাকাগুলোতে ভোট পাওয়ার জন্য বিজেপি এই প্রকল্পকে বিশেষ ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে অনেক বছর ধরে। কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ জোট ক্ষমতায় এসে এই প্রকল্প নিয়ে ধীরে চলো নীতি নিয়েছিল। তবে ২০১২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সেদেশের সুপ্রীম কোর্ট-এর একটি বেঞ্চ (এস কুমার, এস এইচ কাপাডিয়া ও এ কে পাটনায়েকের সমন্বয়ে গঠিত) আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে নির্দেশনা দেয়। ক্ষমতাসীন জোটের অনেকের অনাগ্রহ সত্ত্বেও ভারতের সর্বশেষ পানি সম্পদ মন্ত্রী হরিস রাউত নিজে প্রকল্পের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। যে কারণে সুপ্রীম কোর্টের রায় পেয়ে তাঁর পক্ষে প্রকল্প এগিয়ে নেওয়া সহজ হয়। পরে হরিস রাউত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে **উত্তরখন্ডের** মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন আর কেন্দ্রীয় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গোলাম নবী আজাদকে। তবে সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় এই প্রকল্প আবার যে বেগবান হবে সেটা নিশ্চিত।

উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত প্রস্তাবিত ৩০টি সংযোগ খালের মধ্যে তিনটির ডিটেইল প্রজেক্ট রিপোর্ট [ডিপিআর] তৈরি করা হয়েছে– যার মধ্যে প্রথমে রাখা হয়েছে কেন-বেতোয়া প্রকল্পকে। একমাত্র শেষোক্ত প্রকল্পটিরই Feasibility Study হয়েছে এবং এর বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতাকে

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মেগা হাইড্রোলজিক্যাল প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে সামাজিক ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া যাচাইয়ের যে রেওয়াজ রয়েছে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে নির্দেশনা দেওয়ার আগে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সে বিষয়ও এড়িয়ে গেছে।

উজানে ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে তিস্তার বাংলাদেশ অংশের অবস্থা

ব্যবহার করেই ভারত অন্যান্য সংযোগ প্রকল্পগুলো নিয়ে এগোবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের দু'টি প্রধান দিক রয়েছে– যার একটি বলা হয় পেনিনসুলা অংশ এবং অন্যটিকে বলা হয় হিমালয়ান অংশ। প্রথম অংশে থাকবে দক্ষিণ ভারতের মহানন্দী, গোদাভারী, পেন্নার, কৃষা, কাবেরী ইত্যাদি নদীর মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য ১৬ কৃত্রিম খাল তৈরি। আর দ্বিতীয় দিকে– Northern Himalayan River Development Component-এ থাকবে মূলত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী এবং এগুলোর শাখা নদীতে পানি সংরক্ষণের জন্য কৃত্রিম সংরক্ষণাগার তৈরি। যেখানে অধিক প্রবাহের সময় পানি ধরে রেখে শুষ্ক সময়ে সে পানি ব্যবহার করা হবে। এ জন্য থাকবে ১৪টি কৃত্রিম সংযোগ খাল। উপরোক্ত ৩০টি সংযোগ খালের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৯ হাজার কিলোমিটার!

প্রকল্পের উত্তরাংশই বাংলাদেশের জন্য ভয়ানক উদ্বেগের। কারণ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদীর অববাহিকায় বাংলাদেশেরও কোটি কোটি মানুষের বাস। এই দুটি প্রধান নদী দিয়ে একদিকে যেমন ভারতের পুরো নদী প্রবাহের ৬০ ভাগ প্রবাহিত হয়– তেমনি বাংলাদেশের জন্যও এই দুই নদীর প্রবাহই ভূ-উপরিস্থ পানির প্রধান উৎস। পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি Northern Himalayan River Development Component-এ ১৪টি সংযোগ খালের মাধ্যমে পানি প্রত্যাহার শুরু করা হয় তা হলে বাংলাদেশে এসব নদীর প্রবাহ নিশ্চিতভাবেই বর্তমানের চেয়েও অনেক কমে যাবে। যেহেতু কেন ও বেতোয়ার পানিই প্রথমে যমুনা এবং পরে গঙ্গায় আসে সে কারণে উজানে এই প্রবাহের তথাকথিত 'উদ্বৃত্ত' অংশ থেকে পানি প্রত্যাহারের মানেই হলো ভাটির অববাহিকা হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের পানি প্রাপ্তি কমে যাওয়া।

ভারতে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হলো National Water Development Agency (NWDA)। এই সংস্থার মতে ভারত তিনটি বিবেচনা থেকে এই প্রকল্প নিয়ে এগোচ্ছে। যার মধ্যে আছে:

ক. ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১৭০ কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা যোগানের লক্ষ্যে বাড়তি জমিকে সেচের আওতায় আনা;

খ. গঙ্গা ও **ব্রহ্মপুত্রের** বাৎসরিক বন্যার হাত থেকে আসাম, পশ্চিমবাংলা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশকে রক্ষা করা; এবং

গ. রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের খরাপ্রবণ এলাকার সবুজায়ন।

ভারতের সুপরিচিত পরিবেশবাদী সংগঠক মেধা পাটকার NWDA এর উপরোক্ত দাবির সাথে– বিশেষত ড্যামের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ধারণার সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, ড্যাম যদি বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতো তা হলো কোশি নদীর ড্যাম পূর্ব বিহারকে রক্ষা করতে পারতো। তাঁর মতে, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ভারতের প্রদেশগুলোর মধ্যে বিবাদ আরও বাড়াবে। ভারতে কেন-বেতোয়া প্রকল্পের বাস্তবায়ন উদ্যোগ বাংলাদেশে কীরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের লক হেভেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা পানিবিজ্ঞানী ড. খালেকুজ্জামান বর্তমান প্রতিবেদককে বলেন, আমরা সরাসরি এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হবো। কারণ গঙ্গার প্রবাহ থেকে পানি সরানো হলে ফারাক্কা পয়েন্টে অবশ্যই পানি কম আসবে এবং যার ফলে গঙ্গাচুক্তি থাকার পরও আমরা পানি পাবো না।

আলতাফ পারভেজ: লেখক ও গবেষক।

altafparvez@yahoo.com

পদবি প্রথা বিলুপ্তিকরণ প্রসঙ্গে

এ্যাডভোকেট বাবুল (রবিদাস)

'প্রথা' শব্দের ইংরেজি শব্দ হলো 'Custom' বা ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Usual practice বাংলা প্রতিশব্দ হলো রেওয়াজ। প্রথা শব্দকে বিশ্লেষণ করলে এর অর্থ দাঁড়ায় প্রচলিত সামাজিক আচার-আচরণ বা নিয়ম কানুন বা পদ্ধতি। প্রথা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রত্যেক জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব প্রথা আছে।

'প্রথা' হচ্ছে একটি অলিখিত নিয়ম কানুন। যা কেউ মানতেও পারে আবার নাও মানতে পারে। সামাজিক প্রথাকে কেউ ভঙ্গ করলে সমাজ বাদী হয় এবং প্রতিকার বা প্রতিবাদ করতে সমাজকে দেখা যায়। প্রথা হলো অভ্যাসগত ব্যবহার যা সমাজে ব্যাপকভাবে অনুসরণ করে চলা হয়। প্রথাকে বলা যায় সমাজ কর্তৃক আরোপিত অভ্যাস (Sanctioned Habit)।

'প্রথাকে' সমাজে টিকে রাখতে হলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে। তা হচ্ছে যৌক্তিকতা, বিধিবদ্ধ আইনের সহিত সঙ্গতি, নিরবিচ্ছিন্ন অনুসরণ, ন্যায্য অধিকার হিসাবে অনুসরণ, প্রাচীনত্ব, সুনির্দিষ্ট, খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা হয় প্রথাটি বৈধ। ডায়াসের মতে, প্রথা অবশ্যই বিধিবদ্ধ আইনের বা অলিখিত আইনের মৌলিক বিধিগুলোর পরিপন্থি হবে না। বিধিবদ্ধ আইনের পরিপন্থি প্রথা বাতিল বলে গন্য হবে। কোনো প্রথা যদি কোনো আইনের পরিপন্থি বা জনকল্যাণের পরিপন্থি হয়, তা হলে তা বাতিল বলে গন্য হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বৈধ প্রথার সকল গুণই যদি কোনো প্রথার মধ্যে থাকে কিন্তু যদি তা প্রচলিত আইনের পরিপন্থি হয় তাহলে সেটা বাতিল হবে। কারণ কোনো প্রথাই প্রচলিত আইন, নৈতিকতা বিরোধী, অথবা সাধারণ নিয়মের পরিপন্থি হতে পারবে না। যেমন এক সময় হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে লর্ড বেন্টিংকের সময় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহানুভব ব্যক্তিদের উদ্যোগে আইন সভা কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। অবস্থাধীনে এখন কেউ প্রথার দোহাই দিয়ে সতীদাহের ব্যবস্থা করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। অর্থাৎ আইনের পরিপন্থি প্রথা বাতিল। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রথার প্রচলন দেখা যায়। আজকের আলোচ্য বিষয় হিসাবে 'পদবি প্রথা' আলোচনা করবো। আমাদের দেশের সকল মানুষ নামের প্রথম এবং শেষে কোনো না কোনো শব্দ বা পদবি ব্যবহার করে থাকে। মানুষ সময়ে সময়ে যুগে যুগে বিভিন্ন শব্দ বা পদবি নামের আগে বা পরে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সংযুক্ত বা পরিত্যাগ করে ফেলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৃটিশ সময়ের বহু পুরাতন দলিলে মুসলিম ব্যক্তির নামের আগে শ্রী শব্দটি দেখা যেত এবং বর্তমানে মোহাম্মদ পরিলক্ষিত হয়। তবে হিন্দু সনাতন বিশ্বাসের অনুসারী ব্যক্তির নামের পূর্বে শ্রী বা শ্রীমতি শব্দটি এখনো বহাল আছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন্য ইত্যাদি। আমাদের দেশের মানুষ নামের শেষে অথবা প্রথমে বিভিন্ন পদবি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন- চৌধুরী, মণ্ডল, তালুকদার, সরকার, প্রামাণিক, চক্রবর্তী, বন্দোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, আচার্য্য, রায়, দাস, চাকমা, গারো, হরিজন, পাল, দেবনাথ, ঘোষ, সরেন, কিসকু, ওরাও, মালো, মিনজি, বড়ুয়া, আগারওয়ালা, পান্ডে, বাশফোর ইত্যাদি।

এরূপ নামের প্রথমে বা পরে সঙ্গে থাকা পদবিগুলো প্রকৃতপক্ষে কি জনকল্যাণকর? নাকি সকল মানুষের মধ্যে দূরত্ব, অবিশ্বাস, হানাহানি এবং ভেদাভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরিকৃত। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক বাস্তব অবস্থা- উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সাধারণত চৌধুরী পদবিধারী ব্যক্তির লোকজন অপর চৌধুরী পদবিধারী ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, মেলামেশা, বা ছেলে

মেয়েদের বিয়ে দিতে বেশি পছন্দ করে। তদ্রুপ চক্রবর্তী পদবিধারী ব্যক্তি অপর একই পদবিধারী ব্যক্তির সাথে উঠা বসা, আত্মীয়তা বা মেলামেশা ও বিয়ে করতে পছন্দ করে। ফলে চৌধুরী, চক্রবর্তী, মন্ডল, তালুকদার, বন্দোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় পদবিধারী ব্যক্তিগণ তথাকথিত হরিজন, ডোম, হেলা, চাড়াল, রবিদাস, বাইদা, জেলে, শেখ পদবিধারী ব্যক্তিদেরকে সমমর্যাদা ও মনুষ্যজাতি হিসাবে স্বীকৃতি বা অধিকার দিতে চায় না। যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল ও জনহিতকর নয়।

এছাড়াও পদবি নিয়ে সমাজে বাড়াবাড়ি, হিংসা বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয় এবং এর ফলে মানুষের মধ্যে সমাজে পারস্পরিক অনৈক্য সৃষ্টি ও সন্দেহ দূরত্ব বেড়ে যায়। ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পরিবর্তে চরম তিক্ততা ভেদাভেদ ও ফাটল বৃদ্ধি পায়। যেমন- সম্প্রতি জানা যায়, ভারতে বর্ণ প্রথার নির্মম বলির শিকার হয়েছে ১৪ বছর বয়সী বালক নীরাজ কুমার। তার মৃতদেহ গত বছর ২৩ নভেম্বর তাদের বাড়ির নিকটবর্তী একটি মাঠ থেকে উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যে। জানা যায়- উচ্চ বর্ণের হিন্দু এক ব্যক্তির ছেলের নামের সঙ্গে এক দলিত ছেলের নাম মিলে যাওয়ায় তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের বাস্তি জেলার রধুপুর গ্রামের অধিবাসী রাম সুমার তার দুই ছেলের নাম রাখেন নীরাজ ও ধীরাজ। ঘটনাক্রমে একই এলাকার জওহর চৌধুরীর দুই ছেলের নামও নীরাজ ও ধীরাজ। এ কারণে জওহর চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে রাম সুমারকে তার ঐ দুই ছেলের নাম পরিবর্তন করতে চাপ সৃষ্টি করে আসছিলেন বলে পুলিশের এসআই প্রবীন কুমার জানান। জওহর চৌধুরী একাধিক বার রাম সুমারকে কঠোর ভাষায় শাসিয়েছেন।

২০১৩ সালের ২২ নভেম্বর নীরাজ কুমার রাতের খাবারের পর টিভি দেখতে তার এক বন্ধুর বাড়িতে যান। কিন্তু এরপর তিনি আর ফিরে আসেনি এবং পরের দিন পার্শ্ববর্তী মাঠ থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। নীরাজকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন। হত্যাকাণ্ডের পর থেকে জওহর চৌধুরীর দুই পুত্র পলাতক রয়েছে (দৈনিক সকালের খবর)। উপরোক্ত ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটলো কী কারণে? শুধুমাত্র নামের মিল থাকাতে এ ঘটনা ঘটেছে তা নয়। ঘটনার মূল কারণ হলো জওহর চৌধুরীর নামের সাথে চৌধুরী পদবি থাকায় তার মধ্যে অহংকার কাজ করেছে। তিনি ভেবেছেন, তার ছেলেরা চৌধুরী বংশের অর্থাৎ উচ্চ বংশের আর রাম সুমার নিম্ন বংশের লোক। তাই নিম্ন বংশের লোক হয়ে উচ্চ বংশের লোকের ছেলেদের নামের সাথে নাম মিলিয়ে রাখবে তা চৌধুরী সাহেব সহ্য করতে পারেন নি। যার পরিণতিতে রাম সুমারের পুত্রকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এভাবে পদবি এবং বংশ নিয়ে বাড়াবাড়ি চলতে থাকলে দেশ ও জাতির জন্য অকল্যাণকর হবে। সুতরাং পদবি প্রথা অযৌক্তিক, অমানবিক, অন্যায্য ও বে-খাপ্পা, আধুনিক সমাজে বে-মানানও বটে। এজন্য পদবি প্রথা বিলুপ্তির পক্ষে জ্ঞানীজনরা মতামত দিয়েছেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, পূর্বে বহু জ্ঞানীগুণীর নামের সঙ্গে পদবি প্রথা সংযুক্ত ছিল না। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পরশুরাম, ভরত, বশিষ্ট, অর্জুন, ভীম, বাল্মিকী, ফেরদৌসী, সুলতান মাহমুদ, বাবর, আলমগীর, আকবর, টিপু, শেরশাহ, কর্ণ, একলব্ব্য, খালেক ইত্যাদি।

তারা পদবি প্রথাকে পছন্দ করেননি, বরং তা নিরুৎসাহিত করেছেন। কারণ পদবি ব্যবহারের কারণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়।

মানুষকে সঠিক পথে চলার জন্য সে নিয়ম-কানুন বা পদ্ধতি তৈরি করা হয় যা সর্বজন স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত- সেগুলোই আইন। আইন মানুষের জন্য কিন্তু আইনের জন্য মানুষ নয়। আইন কানুন না থাকলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। তাই আইন প্রণেতারা চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করে আইন তৈরি করেন। এমন একটি আইন দরকার এ ধরনের পদবি প্রথা বিলুপ্তির জন্য। জনগণ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ না করলে রাষ্ট্র তথা সরকার প্রয়োজনে কঠোর আইন প্রণয়ন করে পদবি প্রথা দূর করতে পারে। এ প্রসঙ্গে ২৬ জুন, ২০১৩ তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রথার অপকারিতা সম্পর্কে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়, বিভিন্ন সময়ে এমন অনেক প্রথার প্রচলন ঘটেছে যার নিষ্ঠুরতার কোনো সীমা নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সতীদাহ প্রথা, চীনাদের দু'পা বাঁধা প্রথা, সন্তান প্রসবের পূর্বে বাড়ির বাইরে পৃথক রাখার প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। একইভাবে পদবি প্রথা বিলুপ্ত হওয়া আবশ্যক।

মমি সৃষ্টির ব্যাপারে জাপানের উত্তরে এ ধরনের একটি প্রথার প্রচলন ছিল। সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা স্বেচ্ছায় এমনভাবে নিজেদের মৃত্যু ঘটাতেন- যাতে আপনা আপনিই তাদের মৃতদেহ মমিতে পরিণত হতো। এখন পর্যন্ত এ ধরনের ২৪টি মমিই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে জাপানে এ ধরনের প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদিও ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও বিবাহের পূর্বে কুমারি মেয়েদের সতীত্ব পরীক্ষার প্রথা চালু রয়েছে। এ বিষয় নিয়ে ভারতের মধ্য প্রদেশের বেতুল জেলায় চরম আলাপ আলোচনা ও গুঞ্জন চলছে দৈনিক যুগান্তর (২৭/০৬/১৩)। তবে এ ধরনের প্রথা কতটা যৌক্তিক তা ভাবার বিষয়।

সুতরাং আসুন আমরা এ ধরনের কুসংস্কারমূলক যেকোনো প্রথাসহ পদবি প্রথা পরিত্যাগ করে মানবিক সত্ত্বা জাগরিত করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজের বৈষম্য নিরসনে একযোগে কাজ করি।

এ্যাড. বাবুল (রবিদাস): আইনজীবী, জজকোর্ট, জয়পুরহাট।

babulrabidash@gmail.com

মানবাধিকার, তথ্য অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নাগরিক উদ্যোগ-এর কিছু প্রকাশনা

শিরোনাম	প্রকাশনার ধরন	লেখক/সম্পাদক	প্রকাশক	প্রকাশকাল/মূল্য
দলিত ইনিশিয়েটিভস্ ইন বাংলাদেশ	গবেষণা	মাজহারুল ইসলাম আলতাফ পারভেজ	নাগরিক উদ্যোগ ও বিডিইআরএম	অক্টোবর, ২০১৩ মূল্য: ১৫০ টাকা
বৈচিত্র্য ও সামাজিক বঞ্চনা: বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আখ্যান	সম্পাদনা	আলতাফ পারভেজ রমেন বিশ্বাস	নাগরিক উদ্যোগ ও বিডিইআরএম	জুন, ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য: ২০০ টাকা
আমাদের তথ্য আমাদের অধিকার	অনুবাদ	আলতাফ পারভেজ মিজান আলী	নাগরিক উদ্যোগ ও সিএইচআরআই, ভারত	জুন ২০০৯ মূল্য: ১৫০
অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও শ্রমজীবী মানুষ	প্রবন্ধ সংকলন	ড. ফারজানা ইসলাম জাকির হোসেন অমিত রঞ্জন দে	নাগরিক উদ্যোগ ও পাওয়া	জুলাই ২০১০ মূল্য: ১০০
বাংলাদেশের দলিত ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী: চকিত জরিপ	সংকলন	আলতাফ পারভেজ রমেন বিশ্বাস	নাগরিক উদ্যোগ ও বিডিইআরএম	জুলাই ২০১০ মূল্য: ১০০
রাষ্ট্র, উদারীকরণ ও শ্রমজীবীদের সামাজিক নিরাপত্তা: বিপদের মুখে বাংলাদেশ	গবেষণা	আলতাফ পারভেজ	নাগরিক উদ্যোগ ও পাওয়া	সেপ্টেম্বর ২০০৮ মূল্য: ১০০
প্রতিবন্ধিত্ব: প্রেক্ষিত মানবাধিকার ও সেবার মান উন্নয়ন	গবেষণা	জাকির হোসেন ড. আলতাফ হোসেন	নাগরিক উদ্যোগ	জুন ২০১০ মূল্য: ১৫০
অস্পৃশ্যতা, দারিদ্র্য ও পুরুষতন্ত্র-বাংলাদেশে দলিত নারীর বিপন্নতা	গবেষণা	আলতাফ পারভেজ মাজহারুল ইসলাম মনি রানী দাস	নাগরিক উদ্যোগ	সেপ্টেম্বর ২০০৮ মূল্য: ৫০
প্রতিরোধ ও উন্নয়ন	সংকলন	আলতাফ পারভেজ	নাগরিক উদ্যোগ	এপ্রিল ২০০৭ মূল্য: ১০০
বাংলাদেশের নারী শ্রমজীবী	গবেষণা	আলতাফ পারভেজ	নাগরিক উদ্যোগ ও পাওয়া	মার্চ ২০০৭ মূল্য: ৯০
আম্বেদকর কেন বাংলাদেশে জরুরি	সংকলন	আলতাফ পারভেজ	নাগরিক উদ্যোগ ও বিডিইআরএম	নভেম্বর ২০০৮ মূল্য: ৫

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাড়ি নং-৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা
ফোন: ৮১১৫৮৬৮, ফ্যাক্স: ৯১৪১৫১১
ই-মেইল: info@nuhr.org
ওয়েবসাইট: www.nuhr.org

নাগরিক উদ্যোগ-এর সাম্প্রতিক প্রকাশনা

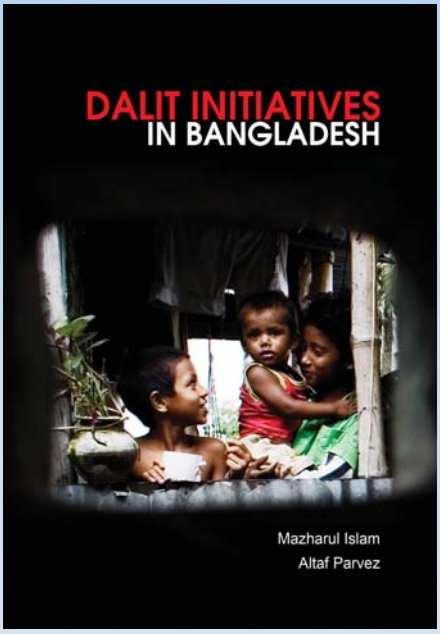

বইয়ের নাম: **দলিত ইনিশিয়েটিভস্ ইন বাংলাদেশ।**
লেখক: মাজহারুল ইসলাম ও
আলতাফ পারভেজ।
প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০১৩।
মূল্য: ১৫০ টাকা।

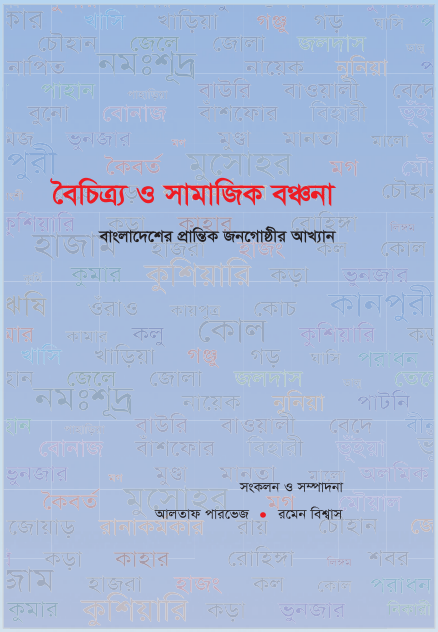

বইয়ের নাম: **বৈচিত্র্য ও সামাজিক বঞ্চনা: বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আখ্যান।**
সংকলন ও সম্পাদনা: আলতাফ পারভেজ ও
রমেন বিশ্বাস।
প্রকাশকাল: জুন, ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
মূল্য: ২০০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান: নাগরিক উদ্যোগ, ৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।